তৃতীয় প্রকার মহব্বত হল, একজন অপরজনকে আখেরাতের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে মহব্বত করা। এই মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে গণ্য হবে। উদাহরণত কোন ব্যক্তি নিজের ওস্তাদ কিংবা পীরকে এ কারণে মহব্বত করে যে, তার মাধ্যমে এলেম ও আমল দুরস্ত হবে এবং এই এলেম ও আমল দ্বারা আখেরাতের কল্যাণ সাধিত হবে। অনুরূপভাবে যে ওস্তাদ তার শাগরেদকে একই কারণে, মহব্বত করে, তার মহব্বতও আল্লাহর ওয়াস্তে গণ্য হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ খয়রাত করে এবং মেহমান সমবেত করে, তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাদ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে রান্না করায়, সে যদি কোন পারদর্শী বাবুর্চিকে মহব্বত করে, তবে এই মহব্বতও আল্লাহর জন্যে হবে। আমরা আরও অগ্রসর হয়ে বলি, যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির যাবতীয় পার্থিব প্রয়োজনাদির দায়িত্ব গ্রহণ করে, অর্থাৎ খাদ্য পোশাক, বাসস্থান ইত্যাদি সকল প্রয়োজন নিজের কাছ থেকে সরবরাহ করে, যাতে সেই ব্যক্তি এলেম ও আমলের জন্যে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং সে ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে এ কারণে মহব্বত করে, তবে সেও আল্লাহর জন্যে মহব্বতকারী হবে। সেমতে পূর্ববর্তীদের মধ্যে কিছু সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, যাদের পার্থিব প্রয়োজনাদির দায়িত্ব কতক ধনী ব্যক্তি গ্রহণ করেছিল। ফলে তারা উভয়ই আল্লাহর জন্যে মহব্বতকারী ছিলেন। আমরা আরও বলি, যে ব্যক্তি শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা এবং নিজের দ্বীনদারী বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কোন সতী নারীকে বিবাহ করে এবং স্ত্রীকে ধর্মীয় উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসাবে মহব্বত করে, তার মহব্বতও আল্লাহর জন্যে হবে। এ কারণেই পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করার অনেক সওয়াব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি, খাদ্যের লোকমা স্ত্রীর মুখে তুলে দিলেও সওয়াব পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আমরা বলি, যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য ও দুনিয়া অর্জন উভয় বিষয়ের উপায় একত্রিত থাকে এবং অন্য এক ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তাআলা ও দুনিয়ার মহব্বত একত্রিত থাকে, তারা উভয় বিষয়ের সুবিধার জন্যে একে অপরকে মহব্বত করে, তবে তারাও আল্লাহ জন্যে মহব্বতকারী গণ্য হবে। কেননা, আল্লাহর মহব্বত হওয়ার জন্যে এটা শর্ত নয় যে, দুনিয়ার মহব্বত সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকবে। এর প্রমাণ, পয়গম্বরগণকে যে দোয়া করতে আদেশ করা হয়েছে, তাতে দুনিয়া ও

আখেরাত উভয়টি একত্রিত করা হয়েছে। সেমতে এক দোয়া এই ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ـ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও।

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর দোয়ায় বলেন ঃ ইলাহী, আমার বিরুদ্ধে আমার শত্রুকে হাসিও না। আমার কারণে আমার বন্ধুর ক্ষতি করো না, আমার ধর্ম কাজে বিপদ দিয়ো না এবং দুনিয়াকে আমার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য করো না। এ দোয়ায় শত্রুর হাসি দূর করা পার্থিব উপকার। তিনি একথা বলেননি যে, দুনিয়াকে কখনও আমার লক্ষ্য করো না; বরং দোয়ায় বলেছেন, দুনিয়াকে আমার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য করো না। আমাদের পয়গম্বর মুহাম্মদ (সাঃ) এক দোয়ায় বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে সেই রহমত প্রার্থনা করছি, যদ্দারা তোমার মাহাত্ম্যের গৌরব দুনিয়া ও আখেরাতে অর্জন করি। তিনি আরও বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী আমাকে দুনিয়া আখেরাতের বিপদ ও আযাব থেকে নিরাপত্তা দান কর। মোট কথা, পার্থিব আনন্দ দু'প্রকার। এক, যা আখেরাতের আনন্দের পরিপন্থী এবং তাতে বাধা সৃষ্টিকারী। এ ধরনের আনন্দ থেকে পয়গম্বরগণ নিজেরা বিরত রয়েছেন এবং অপরকে বিরত থাকতে বলেছেন। দ্বিতীয়, যা আখেরাতের আনন্দের অন্তরায় নয়। এসব আনন্দ থেকে পয়গম্বরগণ কখনও হাত গুটিয়ে নেননি; যেমন বিবাহ করা এবং হালাল খাওয়া ইত্যাদি।

চতুর্থ প্রকার মহব্বত হল, একজন অন্যজনকে নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করা। অর্থাৎ, এতে এলেম ও আমল সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্য হাসিল করা লক্ষ্য হবে না এবং আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু উদ্দেশ্য হবে না। মহব্বতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকারটি সর্বাধিক সূক্ষ্ম ও গোপন হলেও এর অস্তিত্ব সম্ভব। কেননা, প্রবল হল, মহব্বতের প্রভাব

হল, প্রিয়জনকে অতিক্রম করে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও বস্তু পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। উদাহরণতঃ কারও প্রতি কারও মহব্বত বেশী হয়ে গেলে সে প্রিয়জনের প্রিয়জন, খাদেম এবং প্রশংসাকরীকেও মহব্বত করে থাকে। বাকিয়্যা ইবনে ওলীদ বলেন ঃ যখন ঈমানদার অন্য ঈমানদারকে মহব্বত করে, তখন তার কুকুরকেও মহব্বত করে। তার এই উক্তি বাস্তবেও সঠিক। বিখ্যাত আশেকদের অবস্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং কবিদের কবিতা থেকেও একথা বুঝা যায়। এ কারণেই প্রিয়জনের পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রেখে দেয়া হয় এবং গৃহ, মহল্লা ও পড়শীদেরকে মহব্বত করা হয়।

মোট কথা, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় জানা জায়, মহব্বত প্রিয়জনের সত্তা অতিক্রম করে প্রিয়জনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে এটা প্রবল মহব্বতের বৈশিষ্ট্য। এমনিভাবে যখন আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রবল হয়ে অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন আল্লাহ ছাড়া যত বস্তু রয়েছে, সবগুলোর প্রতিই তা সম্প্রসারিত হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ ছাড়া যত কিছু রয়েছে, সবগুলো তাঁর কুদরতের পরিচায়ক। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে কেউ নতুন ফল আনলে তিনি তা চোখে লাগাতেন এবং তাযীম করে বলতেন– আমার পরওয়ারদেগার এই মাত্র একে অস্তিত্ব দান করেছেন। (অর্থাৎ, কোন পাপী হাত পা একে দলিত করেনি এবং মাটিতে পড়ে থাকেনি; বরং এই মাত্র আদেশ পেয়ে অদৃশ্য জগত থেকে অস্তিত্বের জগতে নতুন আগমন করেছে।) সারকথা, আল্লাহর মহব্বত প্রবল হয়ে যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে ছড়িয়ে পড়ে, তখন যে বস্তু সত্তাগতভাবে অপছন্দনীয়, তাও পছন্দনীয় মনে হতে থাকে। সে বস্তু বেদনাদায়ক হলেও মহব্বতের আতিশয্যে ব্যথা অনুভূত হয় না; বরং এটা আমার প্রিয়জনের– এই আনন্দের নীচে ব্যথা চাপা পড়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহর প্রেমে কোন কোন প্রেমিকের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, তারা বলে, আমরা মসিবত ও নেয়ামতের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। কেননা, উভয়টিই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে।

انچه از دوست میرسد نیکو ست বন্ধুর কাছ থেকে যা আসে তা ভালই। কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহর নাফরমানী করে যদি ক্ষমাও পাওয়া যায়, তবু আমি নাফরমানী করতে চাই না। সমনূন (রহঃ)

এ বিষয়টি একটি কবিতায় নিম্নোক্তরূপে ব্যক্ত করেছেন–

হে আল্লাহ! তোমাকে ছাড়া আমার স্বস্তি নেই। তুমি যেমন ইচ্ছা তা পরীক্ষা করে নাও।

আল্লাহর জন্যে শত্রুতার স্বরূপ ঃ প্রকাশ থাকে যে, যাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্যে মহব্বত করা ওয়াজিব, তাদের ক্ষেত্রেই আল্লাহর জন্যে শত্রুতা পোষণ করা জরুরী। উদাহরণতঃ তুমি এক ব্যক্তিকে এ কারণে মহব্বত কর যে, সে আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও প্রিয় বান্দা। এখন যদি সে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে, তবে তার সাথে শত্রুতা রাখা তোমার জন্যে অপরিহার্য হবে। কেননা, সে আল্লাহর নাফরমান ও তাঁর ক্রোধের পাত্র হয়েছে। মোট কথা, যে কারণে মহব্বত হয়, তার বিপরীত কারণ পাওয়া গেলে শত্রুতা হবেই। এদিক দিয়ে মহব্বত ও শত্রুতা একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদের প্রত্যেকটি অন্তরে বদ্ধমূল থাকে এবং প্রবল হওয়ার সময় প্রকাশ পায়। যা প্রকাশ পায়, তদনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম ফুটে উঠে। অর্থাৎ, মহব্বত থেকে নৈকট্য ও একাত্মতা প্রকাশ পায় এবং শত্রুতা থেকে দূরত্ব ও বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কাজে প্রকাশ পাওয়ার পর প্রথমটিকে পরিভাষায় মোআলাত এবং দ্বিতীয়টিকে মোআদাত বলা হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছে– তুমি আমার ব্যাপারে কারও সাথে মোআলাত অথবা মোআদাত করেছ কি?

কোন ব্যক্তির মধ্যে এককভাবে মোআলাত কিংবা মোআদাত পাওয়া গেলে সেখানে ব্যাপার সহজ। অর্থাৎ, কারও মধ্যে কেবল আল্লাহর আনুগত্য আছে বলে জানলে তাকে তুমি মহব্বত করতে পার কিংবা কেবল পাপাচার আছে বলে জানলে তার সাথে শত্রুতা রাখতে পার, কিন্তু সমস্যা তখন দেখা দেয়, যখন কারও মধ্যে পাপ ও পুণ্য উভয়টি পাওয়া যায়। তখন তুমি বলতে পার, এর একটি অপরটির বিপরীত বিধায় মহব্বত ও শত্রুতা একত্রিত করব কিরূপে? এর জওয়াব, আল্লাহ তাআলার জন্যে এই উভয় বিষয়ের মধ্যে বৈপরীত্য নেই, যেমন মানুষের ক্ষেত্রে নেই। কেননা, এক ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হতে পারে, যার কিছু পছন্দনীয় ও কিছু অপছন্দনীয়। কাজেই তুমি সেই ব্যক্তিকে কোন কারণে মহব্বত করবে এবং কোন কারণে শত্রুতা করবে। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তির স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী কিন্তু বজ্জাত। এমতাবস্থায়

সে তাকে এক কারণে মহব্বত করবে এবং এক কারণে ঘৃণা করবে। প্রশ্ন হয়, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ইসলাম আনুগত্যের মাপকাঠি। অতএব ইসলাম সত্ত্বেও মুসলমানের সাথে শত্রুতা রাখা যাবে কিরূপে? এর জওয়াব, ইসলামের কারণে মুসলমানকে মহব্বত করবে এবং গোনাহের কারণে তার সাথে শত্রুতা করবে। কাফের ও পাপাচারীর সাথে শত্রুতায় যেমন একটু পার্থক্য হবে, তেমনি ইসলামের কারণে মহব্বত ও গোনাহের কারণে শত্রুতার মধ্যে একটু পার্থক্য করলেই চলবে এবং এতটুকু মহব্বত দ্বারাই তার প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আনুগত্য ও ত্রুটিকে নিজের ব্যাপারে আনুগত্য ও ত্রুটির অনুরূপ মনে কর। উদাহরণতঃ যে ব্যক্তি কোন উদ্দেশে তোমার সাথে একমত হয় এবং অন্য উদ্দেশে বিরোধিতা করে, তার সাথে এমন মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন কর যে, তার প্রতি সন্তুষ্টও হবে না এবং অসন্তুষ্টও হবে না। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেও তোমার এরূপ অবস্থা হওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন হল, শত্রুতা কিভাবে প্রকাশ করা যাবে? জওয়াব, কথায় ও কাজে শত্রুতা প্রকাশিত হতে পারে। কথায় এভাবে যে, কখনও তার কর্মে সাহায্য করবে না এবং কখনও তার কর্ম নষ্ট করার চেষ্টা করবে, কিন্তু শত্রুতা অপরাধ অনুযায়ী হতে হবে । কেউ যদি ভুল করে নিজেও অনুতপ্ত হয় এবং পরবর্তীতে না করে, তবে ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম। যদি কেউ একটির পর একটি সগীরা অথবা কবীরা গোনাহ করতে থাকে, তবে তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে পূর্বে গাঢ় বন্ধুত্ব না থাকলে এভাবে শত্রুতার চিহ্ন প্রকাশ করা জরুরী যে, তুমি তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তার প্রতি কম মনোযোগ দেবে অথবা গাল মন্দ করবে। এটা পৃথক হয়ে যাওয়ার তুলনায় কঠিন। সুতরাং সগীরা গোনাহে আলাদা হয়ে যাবে এবং কবীরা গোনাহে গালিগালাজ করবে।

অনুরূপভাবে কাজের মাধ্যমে শত্রুতা প্রকাশ করারও দুটি স্তর রয়েছে। নিম্নস্তর হচ্ছে সাহায্য ও আনুকূল্য বর্জন করা এবং উচ্চস্তর হচ্ছে তার কাজ নষ্ট করে দেয়া এবং তার কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে না দেয়া। যেমন, শত্রুরা একে অপরের উদ্দেশ্য সাধনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সেসব উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত, যদ্দরা গোনাহের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে গোনাহ করতে সক্ষম না হয়। পক্ষান্তরে গোনাহ বর্জনে যেসকল উদ্দেশ্যের কোন প্রভাব নেই, সেসব উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দেয়া উচিত

নয়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি মদ্যপান করে আল্লাহর নাফরমানী করেছে। এখন সে একজন মহিলাকে বিবাহ করতে চায়। বলাবাহুল্য, বিবাহ না মদ্যপানে বাধা দেয় না উৎসাহ প্রদান করে। কাজেই তুমি সক্ষম হলে তাকে সাহায্য করে বিবাহ করিয়ে দাও। আর ইচ্ছা করলে বাধা দিয়ে বিবাহ ভণ্ডুল করে দাও। এমতাবস্থায় বাধা দেয়া তোমার জন্যে জরুরী নয়। হাঁ, ক্রোধ প্রকাশ করার জন্যে সাহায্য না করলে দোষ নেই। সে যদি তোমার কোন আত্মীয়ের সাথে বিশেষ অপরাধ করে থাকে, তবে তার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করা খুব ভাল। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে—

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُّؤْتُوا أُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে গুণী ও ধনী ব্যক্তিরা যেন আত্মীয়, মিসকীন ও মোহাজেরদের দান না করার জন্যে কসম না খায়। তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করে। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করুন?

এই আয়াতের শানে নুযুল হল, মেসতাহ্ ইবনে আছাছা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনায় যোগদান করেছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) পূর্বে তাকে অর্থ সাহায্য দিতেন। এ ঘটনার পর তিনি তাকে কিছু দেবেন না বলে কসম খেলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এখানে মেসতাহের অপরাধ নিঃসন্দেহে গুরুতর ছিল। সে হযরত আবু বকরের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছিল, কিন্তু সিদ্দীকগণের নীতি হল, কেউ তাদের উপর জুলুম করলে ক্ষমা করে দেয়া। তাই আয়াতে এ শিক্ষাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এর পর হযরত আবু বকর মেসতাহের অর্থ সাহায্য পুনরায় চালু করে দেন।

যে নিজের উপর জুলুম করে তার প্রতি অনুগ্রহ করাই উত্তম, কিন্তু যে অপরের উপর জুলুম করে এবং আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে, তার প্রতি অনুগ্রহ করা মজলুমের প্রতি অন্যায় করারই নামান্তর। অথচ মজলুমের হকের প্রতি খেয়াল রাখা এবং জালেম থেকে মুখ ফিরিয়ে মজলুমের মনকে শক্ত করা আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন, কিন্তু যদি তুমি

নিজেই মজলুম হও, তবে ক্ষমা করে দেয়াই তোমার জন্যে উত্তম। গোনাহগারদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করার ব্যাপারে সকলেই একমত যে, জালেম, বেদআতী এবং আল্লাহ তাআলার সেসব নাফরমানীতে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করা উচিত, যদ্দ্বারা অপরের ক্ষতি হয়। আর যারা নিজের বিরুদ্ধে গোনাহ করে, তাদের ব্যাপারেও পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেউ এমন গোনাহগারদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি দিয়েছেন এবং কেউ অতি মাত্রায় অপছন্দ করে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ত্যাগ করেছেন। সেমতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সামান্য বিষয়ে বুযুর্গদের সাথে মেলামেশা বর্জন করতেন। একবার ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন বলেছিলেন– কিছু চাই না। তবে বাদশাহ কিছু পাঠিয়ে দিলে তা কবুল করে নেব। এ কথার কারণে ইমাম আহমদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করেন। অনুরূপভাবে তিনি হারেস মুহাসেবী (রহঃ)-এর সাথেও সাক্ষাৎ বর্জন করেন এ কারণে যে, তিনি মুতাযেলা সম্প্রদায়ের খণ্ডনে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। ইমাম আহমদ বললেন ঃ এ পুস্তিকায় তুমি প্রথমে মুতাযেলীদের আপত্তি উদ্ধৃত করেছ, এর পর জওয়াব দিয়েছ। ফলে তুমি নিজেই মানুষকে সন্দেহে পতিত করেছ। প্রশ্ন হয়, শত্রুতা প্রকাশের নিম্নস্তর হচ্ছে সাক্ষাৎ বর্জন করা, মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং সঙ্গ সাহায্য বন্ধ করে দেয়া। এসব বিষয় কি ওয়াজিব? মানুষ কি এগুলো না করলে গোনাহগার হবে? জওয়াব হচ্ছে, বাহ্যিক জ্ঞান অনুযায়ী এসব বিষয় করতে মানুষ বাধ্য নয় এবং এগুলো ওয়াজিব হওয়ারও বিধান পাওয়া যায় না। কেননা, আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, যারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর যমানায় মদ্যপান করেছে এবং কুকর্ম করেছে, তারা তাঁর সাক্ষাৎ থেকে সম্পূর্ণ বাদ পড়েনি; বরং কেউ কেউ তাদের গালমন্দ করত, শত্রুতা প্রকাশ করত, মুখ ফিরিয়ে নিত, কিন্তু কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করত না। আবার কেউ কেউ তাদেরকে করুণার দৃষ্টিতেও দেখত এবং তাদের কাছ থেকে দূরে থাকা পছন্দ করত না।

আল্লাহর জন্যে শত্রুতার স্তর ঃ প্রশ্ন হয়, কর্মের মাধ্যমে শত্রুতা প্রকাশ করা ওয়াজিব না হলেও এটা যে মোস্তাহাব, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। অবাধ্য ও ফাসেকদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। অতএব তাদের সাথে ব্যবহারে পার্থক্য কিরূপে করতে হবে? সকলের সাথে একই রকম ব্যবহার করা উচিত কিনা? এর জওয়াব হচ্ছে, খোদাদ্রোহীরা সাধারণতঃ

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) কাফের, (২) সেই বেদআতী, যে তার বেদআতের প্রতি অন্যকে আহ্বান করে এবং (৩) যে কাজেকর্মে গোনাহ করে, কিন্তু সঠিক আকীদা রাখে। এখন প্রত্যেক শ্রেণীর সাথে ব্যবহারের স্তর আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথমে কাফেরের বিধান শুন। কাফের যুদ্ধাবস্থায় থাকলে সে হত্যা ও গোলাম করার যোগ্য। আর যিম্মী হলে তাকে নির্যাতন করা বৈধ নয়। তবে মুখ ফিরিয়ে রাখতে হবে, তার পথেঘাটে নত হয়ে চলতে হবে। তুমি প্রথমে তাকে সালাম বলবে না। সে "আসসালামু আলাইকা" বললে তুমি জওয়াবে 'ওয়া আলাইক' বলবে। তার সাথে কথাবার্তা বলা, লেনদেন করা এবং সঙ্গে খাওয়া জায়েয, কিন্তু এগুলো না করা উত্তম, কিন্তু বন্ধুদের সাথে যেরূপ খেলাখুলি মেলামেশা করা হয়, তা যিম্মীর সাথে করা কঠোর মাকরূহ। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না যে, তারা সেই ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করে, যে আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতা করে, যদিও সে তাদের পিতা অথবা পুত্র হয়। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের অভিন্ন শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মুসলমান ও মুশরিক এত দূরে যে, তাদের একজনের অগ্নি অন্যজনের দৃষ্টিগোচর হয় না।

দ্বিতীয়তঃ সে বেদআতী, যে তার বেদআতের প্রতি অন্যকে আহবান করে। তার বিধান হচ্ছে, যদি বেদআত কাফের করে দেয়ার মত হয় তবে তার ব্যাপারটি যিম্মীর চেয়ে গুরুতর। আর যদি এমন বেদআত হয়, যদ্দ্বারা কাফের হয় না, তবে তার ব্যাপার তার মধ্যে ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে কাফেরের তুলনায় হালকা, কিন্তু মুসলমানদের উচিত তাকে কাফেরের তুলনায় অধিক অপছন্দ করা। কেননা, কাফেরের অনিষ্ট মুসলমানদের দিকে সংক্রামক নয়। কেননা, মুসলমানরা তাকে কাফের

বলে বিশ্বাস করে। ফলে তার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং সে নিজেও মুসলমান হওয়ার দাবী করে না, কিন্তু বেদআতী একথাই বলে যে, সে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করে সেটাই সত্য। সুতরাং তার অনিষ্ট অন্যের দিকে সংক্রমিত হয়। অতএব তার সাথে শত্রুতা রাখা, সাক্ষাৎ বর্জন করা, তাকে ঘৃণা করা, মন্দ বলা এবং মানুষকে তার কাছে আসতে না দেয়া চরম পর্যায়ের মোস্তাহাব। সে নির্জনে সালাম করলে জওয়াব দিতে দোষ নেই, কিন্তু যদি জানা যায়, সালামের জওয়াব না দিলে বেদআতের প্রতি তার মন বীতশ্রদ্ধ হবে; তার জওয়াব না দেয়া উত্তম। কেননা, সালামের জওয়াব দেয়া যদিও ওয়াজিব, কিন্তু সামান্য উপযোগিতার কারণেও তা ওয়াজিব থাকে না। উদাহরণতঃ কেউ প্রস্রাব পায়খানায় থাকলে সালামের জওয়াব দেয়া তার জন্যে ওয়াজিব নয়। বেদআতীকে শিক্ষা দেয়া একটি জরুরী উপযোগিতা; যদি বেদআতী জনসমাবেশে সালাম করে, তবে জওয়াব বর্জন করা উত্তম, যাতে জনসাধারণ তাকে ঘৃণা করে এবং তার বেদআতকে খারাপ মনে করে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বেদআতীকে ধমকায়, তার কথা ও কাজ অমান্য করে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে শান্তি ও ঈমান দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি বেদআতকে অপমানিত করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দেবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বেদআতীর সাথে নম্রতা করে, তার প্রতি সম্মান দেখায় অথবা প্রফুল্ল বদনে তার সাথে সাক্ষাৎ করে, সে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ বিষয়কে তুচ্ছ মনে করে।

তৃতীয় পর্যায়, যে কাজকর্মে গোনাহ্ করে, কিন্তু সঠিক আকীদা পোষণা করে, এরূপ গোনাহ তিন প্রকার।

প্রথম প্রকার গোনাহ, যদ্দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়; যেমন জুলুম, ছিনতাই, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, পরনিন্দা ইত্যাদি। যারা এ ধরনের গোনাহ করে, তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া উত্তম। কেননা, মানুষের জন্যে কষ্টদায়ক গোনাহ কঠোর হয়ে থাকে এবং এক গোনাহ অপর গোনাহ থেকেও কঠোর হয়ে থাকে। যেমন, খুনের জুলুম, অর্থের জুলুম ও ইযযতের জুলুম। এই গোনাহকারীদেরকে অপমান করা ও তাদের প্রতি বিমুখ হওয়া খুবই জরুরী।

দ্বিতীয় প্রকার সে গোনাহগার, যে গোলযোগ সৃষ্টি করে, মানুষকে গোলযোগে উৎসাহিত করে। এতে মানুষের কষ্ট না হলেও তাদের ধর্ম বিনষ্ট হয়। এটা প্রথম প্রকারের নিকটবর্তী এবং তা থেকে কিছু হালকা। এর বিধানও অপমান করা, মুখ ফিরিয়ে নেয়া, আলাদা থাকা এবং সালামের জওয়াব না দেয়া।

তৃতীয় প্রকার সেই গোনাহগার, যে মদ্যপান অথবা কোন ওয়াজিব বর্জন করে ফাসেক হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তির ব্যাপার হালকা, কিন্তু গোনাহ করা অবস্থায় তাকে দেখলে প্রয়োজনে মারপিট করে হলেও কার্যকর পন্থায় বাধা দিতে হবে। কেননা, কুকর্ম থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব। যদি গোনাহে লিপ্ত অবস্থায় দেখা না যায় কিন্তু জানা থাকে যে, সে অমুক গোনাহে অভ্যস্ত, তবে উপদেশে কাজ হবে মনে করলে উপদেশ দেয়া ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে নম্রভাবে অথবা কঠোরভাবে উপদেশ দেবে। আর যদি জানা যায়, উপদেশে কাজ হবে না, তবে সালামের জওয়াব না দেয়া এবং মেলামেশা বর্জন করার ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে এটা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যে পাপাচারের গোনাহ বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাতে কেবল গোনাহগারেরই ক্ষতি হয়, তা যে খুব হালকা ব্যাপার, তার দলীল এই হাদীস– জনৈক মদ্যপায়ীকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে কয়েকবার প্রহার করা হয়। এর পরও সে মদ্যপান থেকে বিরত হল না। ফলে আবারও ধৃত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আনীত হল। জনৈক সাহাবী বললেন ঃ তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। সে অত্যধিক মদ্যপান করে। রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবীকে বললেন ঃ আপন ভ্রাতার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। এ থেকে বুঝা গেল, নম্রতা করা রুক্ষতা ও কঠোরতার তুলনায় উত্তম।

সংসর্গের গুণাবলী ঃ প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক মানুষ সংসর্গের যোগ্যতা রাখে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতি অনুসরণ করে। কাজেই তোমাদের কেউ কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে তাকে যাচাই করে নেবে। সুতরাং যার সংসর্গ অবলম্বন করা হবে, তার মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলী থাকা অবশ্যই জরুরী। সংসর্গের মাধ্যমে যে সকল উপকারিতা কাম্য হয়ে থাকে, সেগুলোর দিক দিয়ে এসব গুণ সংসর্গের জন্যে শর্ত হওয়া উচিত। কেননা, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে

পৌঁছার জন্যে যা জরুরী, তাকেই শর্ত বলা হয়। অতএব জানা গেল, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শর্তের বিকাশ ঘটে।

পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় প্রকার উপকারিতাই সংসর্গের মাধ্যমে কাম্য হয়ে থাকে। পার্থিব উপকারিতা হল অর্থ অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা উপকৃত হওয়া কিংবা শুধু সাক্ষাৎ ও সাহচর্য দ্বারা মনোরঞ্জন করা ইত্যাদি। এগুলো বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ধর্মীয় উপকারিতাসমূহের মধ্যেও অনেক উপকারিতার সমাহার হয়ে থাকে; যেমন এক, জ্ঞানগরিমা ও কর্মের দ্বারা উপকৃত হওয়া; দুই, এবাদতে উত্ত্যক্তকারী ও বাধাদানকারীদের জ্বালাতন থেকে নিরাপদ থাকার দিক দিয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা উপকৃত হওয়া; তিন, যাতে জীবিকার অন্বেষণে সময় নষ্ট না হয় সেজন্যে কারও টাকা পয়সা দ্বারা উপকার লাভ করা; চার, প্রয়োজন ও অভাব অনটনে সাহায্য নেয়া, পাঁচ, কেবল দোয়ার বরকত হাসিল করা। ছয়, আখেরাতে সুপারিশ আশা করা। পূর্ববর্তী জনৈক মনীষী বলেন ঃ অনেক বন্ধু তৈরী কর। কেননা, প্রত্যেক ঈমানদার বন্ধুই তোমার জন্যে সুপারিশ করবে। সুতরাং আশ্চর্য নয় যে, তুমি কোন বন্ধুর শাফায়াতে জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে। এক তফসীরে–

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۔

আয়াতের অর্থ এই বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার বন্ধুদের পক্ষে ঈমানদারদের শাফায়াত কবুল করে বন্ধুদেরকে তাদের সাথে জান্নাতে দাখিল করবেন। কথিত আছে, কোন বান্দার মাগফেরাত হয়ে গেলে সে তার বন্ধুদের জন্যে সুপারিশ করবে। এ কারণেই কিছুসংখ্যক পূর্ববর্তী মনীষী সংসর্গ, সম্প্রীতি ও মেলামেশা করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন! তাদের মতে একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা মন্দ কাজ।

উপরোক্ত ধর্মীয় উপকারিতাসমূহের প্রত্যেকটিরই কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। যার অবর্তমানে এসব উপকারিতা অর্জিত হয় না। এসব শর্তের বিস্তারিত বর্ণনা সুদীর্ঘ। তবে সংক্ষেপে বলা যায়, যে ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন করা হবে, তার মধ্যে পাঁচটি বিষয় থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথম, জ্ঞানবুদ্ধি, দ্বিতীয়, সচ্চরিত্রতা, তৃতীয়, পাপাচারী না হওয়া, চতুর্থ, বেদআতী না হওয়া এবং পঞ্চম, সংসারলোভী না হওয়া।

জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন এজন্য যে, এটাই আসল পুঁজি। নির্বোধ ব্যক্তির সংসর্গে কোন কল্যাণ নেই। এ সংসর্গের পরিণাম নির্জনতা ও বিচ্ছিন্নতা; যদিও তা অনেক দিনের হয়। হযরত আলী (রাঃ) এক কবিতায় বলেন, তুমি আমার কথা মেনে মূর্খের বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাক। মূর্খের বন্ধুত্ব জ্ঞানীকে বরবাদ করে দেয়। মূর্খের সাথে বন্ধুত্বের পরিণামস্বরূপ মানুষ তোমাকে মূর্খ বলে স্মরণ করবে। সা'দী সিরাজী তাঁর পান্দেনামায় এ বিষয়টিই এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

زجاهل حذركردن اولى بود – كزوتنگ دنيا وعقبى بود ۔

অর্থাৎ, মূর্খের কাছ থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। কারণ, এতে ইহকাল ও পরকালে দোষী হতে হয়। কেননা, নির্বোধ ব্যক্তি উপকার ও সাহায্যের নিয়তে কোন কিছু করলে তা বন্ধুর জন্যে ক্ষতির কারণ হয়ে যেতে পারে। এ কারণেই বলা হয়– নির্বোধের কাছ থেকে আলাদা থাকা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের নামান্তর। আমাদের মতে সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে বাস্তবতার আলোকে বিষয়সমূহ হৃদয়ঙ্গম করে।

সচ্চরিত্রতার প্রয়োজন এ কারণে যে, অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাস্তবতার আলোকে বিষয়সমূহ হৃদয়ঙ্গম করে, কিন্তু তাদের উপর যখন ক্রোধ কিংবা প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে যায় অথবা কৃপণতা ও কাপুরুষতার চাপ পড়ে, তখন তারা প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে বসে এবং যে বিষয়কে তারা ভাল মনে করে, তার বিপরীত কাজ করে। কারণ, তারা নিজেদের স্বভাবকে দমন করতে এবং চরিত্র সংশোধন করতে অক্ষম হয়ে থাকে। এরূপ ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বনে কোন ফায়দা নেই।

পাপাচারীর সংসর্গ অবলম্বন না করার কারণ, যে পাপাচারী তার পাপাচারে পীড়াপীড়ি করে, ফলে তার সংসর্গেও কোন উপকার হয় না। কেননা, যে আল্লাহকে ভয় করে, সে কবীরা গোনাহে পীড়াপীড়ি করে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, তার বন্ধুত্বে ভরসা করা অনুচিত। স্বার্থ বদলে গেলে সে-ও বদলে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۔

অর্থাৎ, তার আনুগত্য করো না; যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, আর যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ -

অর্থাৎ, যে এ বিষয়ে বিশ্বাসী নয়, সে যেন আপনাকে এর প্রতি বিমুখ না করে দেয় এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا -

অর্থাৎ, অতঃপর মুখ ফিরিয়ে নিন সে ব্যক্তির দিক থেকে, যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কেবল পার্থিব জীবন কামনা করে।

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ -

অর্থাৎ, আমার প্রতি প্রবর্তন করে, আপনি তার পথ অনুসরণ করুন।

এছাড়া পাপাচার ও পাপাচারীকে দেখলে এবং তার সাথে মেলামেশা করলে গোনাহ অন্তরের জন্যে সহজ হয়ে যায় এবং গোনাহের প্রতি অন্তরে ঘৃণা থাকে না। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেন ঃ জালেমদের প্রতি তাকিয়ো না। তাকালে তোমার ভাল আমল বরবাদ হয়ে যাবে। পাপাচারীদের থেকে আলাদা থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا -

অর্থাৎ, যখন মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলে তখন তারা বলে– সালামত (নিরাপত্তা)। অর্থাৎ, আমরা যেন তোমাদের গোনাহ থেকে সালামত থাকি।

বেদআতীর কাছ থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন এজন্যে যে, তার সংসর্গে থাকলে তার বেদআত ও অনিষ্ট অপরের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার আশংকা থাকে। বেদআতী ব্যক্তি মেলামেশা থেকে বঞ্চিত ও পৃথক থাকারই যোগ্য। এমতাবস্থায় তার সংসর্গ কিরূপে অবলম্বন করা যায়। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিবের (রহঃ) রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ওমর (রাঃ) ধর্মপরায়ণ বন্ধুর অন্বেষণে উৎসাহ দিতে গিয়ে বলেন ঃ সত্যিকার বন্ধুকে অপরিহার্য করে নাও এবং তার সমর্থনে জীবন অতিবাহিত কর। কেননা, সে সুখের সময় তোমার শোভা এবং অসময়ে তোমার সহায় হবে। শত্রুর কাছ থেকে সরে থাক। নতুবা তার কুকর্ম শিখে ফেলবে। কাজ-কারবারে খোদাভীরুদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ কর।

যারা দুনিয়ালোভী, তাদের সংসর্গ বিষতুল্য। কেননা, অপরের অনুকরণ করা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। বরং একজন তার সহচর অন্যজনের স্বভাব থেকে কিছু চুরি করে নেয়; অথচ সহচর তা টেরও পায় না। সুতরাং দুনিয়ালোভীর সাথে উঠাবসা করলে দুনিয়ার লোভই উন্নতি লাভ করবে। পক্ষান্তরে সংসারত্যাগীর সাথে উঠাবসা করলে সংসার ত্যাগের প্রেরণাই বৃদ্ধি পাবে। এ কারণেই দুনিয়াদারদের সংসর্গ মাকরূহ এবং পরকালের প্রতি আগ্রহীদের সংসর্গ মোস্তাহাব।

উপরে সচ্চরিত্রতার বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। আলকামা আতারদী জীবন সায়াহ্নে তার পুত্রকে ওসিয়ত করতে গিয়ে বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ বৎস, তোমার কারও সংসর্গে থাকার প্রয়োজন হলে এমন ব্যক্তির সাথে থাকবে, যার খেদমত করলে সে তোমার হেফাযত করবে। তার কাছে বসলে সে তোমাকে সৌন্দর্য দান করবে। তোমার তরফ থেকে কোন কষ্ট পেলে সে তা বরদাশত করবে। তুমি কল্যাণের হাত প্রসারিত করতে চাইলে সে প্রসারিত করবে। তোমার কোন গুণ দেখলে সে তা গণ্য করবে এবং কোন দোষ দেখলে তা প্রতিহত করবে। তুমি তার কাছে কিছু চাইলে সে দেবে। তুমি বিপদগ্রস্ত হলে সে সমবেদনা প্রকাশ করবে। তোমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবে। তুমি কোন কাজ করতে চইলে সে তোমাকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেবে। বলাবাহুল্য, এ ওসিয়ত সংসর্গের সকল কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। সবগুলো কর্তব্য পালন করা এতে শর্ত করা হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম (রাহঃ) বলেন ঃ খলীফা মামুন এই ওসিয়তের কথা শুনে বললেন ঃ এরূপ লোক কোথায়? কেউ বলল ঃ আপনি কি এই ওসিয়তের কারণ বুঝতে পেরেছেন? খলীফা বললেন ঃ না। লোকটি বলল ঃ আলকামার উদ্দেশ্য ছিল কারও সংসর্গ অবলম্বন না করা। তাই তিনি এতশব শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। জনৈক আবেদ ব্যক্তি বলেন ঃ সেই লোকের সংসর্গ অবলম্বন করবে, যে তোমার ভেদ গোপন করে, দোষত্রুটি প্রকাশ না করে, বিপদে সাহায্য করে, উত্তম বস্তুসমূহে তোমাকে অগ্রাধিকার দেয়, তোমার চরিত্র মাধুর্য প্রচার করে এবং দোষ অব্যক্ত রাখে। এরূপ লোক পাওয়া না গেলে নিজের সংসর্গই অবলম্বন করবে। হযরত আলী (রাঃ) এক কবিতায় বলেন ঃ সেই তোমার সত্যিকার বন্ধু যে তোমার সাথে থাকে, তোমার কল্যাণের জন্যে নিজের ক্ষতি করে। দৈব-দুর্বিপাকে পড়ে

তোমার অবস্থা শোচনীয় হলে সে নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে তোমাকে সুখদান করে। জনৈক আলেম বলেন ঃ কেবল দু'ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন করা উচিত। এক, যার কাছ থেকে তুমি কিছু ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা করতে পার, ফলে তোমার উপকার হবে। দুই, যাকে তুমি কিছু ধর্মের কথাবার্তা বললে সে মেনে নেবে। এছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির ধারে-কাছেও যেয়ো না। কেউ কেউ বলেন ঃ মানুষ চার প্রকার– (১) সম্পূর্ণ মিষ্ট, যা খেয়েও খাওয়ার স্পৃহা থেকে যায়, (২) সম্পূর্ণ তিক্ত, যা খাওয়া যায় না, (৩) টক-মিষ্ট; এরূপ ব্যক্তি তোমার কাছ থেকে কিছু হাসিল করার আগেই তুমি তার কাছ থেকে কিছু হাসিল কর এবং (৪) লবণযুক্ত; এরূপ ব্যক্তিকে কেবল প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানো উচিত।

হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (রঃ) বলেন ঃ পাঁচ ব্যক্তির সঙ্গ অবলম্বন করো না। প্রথম, মিথ্যাবাদী। তুমি তার কাছে প্রতারিত হবে। সে মরীচিকার মত– দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করবে এবং নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করবে। দ্বিতীয়, নির্বোধ। তুমি তার কাছে কিছুই পাবে না। সে তোমার উপকার করতে চেয়েও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ অপকার করে বসবে। তৃতীয়, কৃপণ। তুমি তার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মুখাপেক্ষী হলে সে তোমার সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করবে। চতুর্থ, কাপুরুষ। সে বিপদ মুহূর্তে তোমাকে ছেড়ে পালাবে। পঞ্চম, ফাসেক। সে এক লোকমা অথবা এরও কমের বিনিময়ে তোমাকে বিক্রি করে দেবে। 'লোকমার কম' কি– জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ লোকমা আশা করার পর তা না পাওয়া। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ আমার কাছে কোন চরিত্রহীন কারী এসে বসলে তার তুলনায় চরিত্রবান ফাসেকের বসা ভাল মনে হয়। ইবনুল হাওয়ারী বলেন ঃ আমাকে আমার ওস্তাদ আবু সোলায়মান বলেছেন– হে আহমদ! দু'ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও কাছে বসো না। এক, যার কাছ থেকে তুমি সাংসারিক কাজ-কারবারে উপকার লাভ করতে পার এবং দুই, যার সাথে থাকলে তোমার আখেরাতের উপকার হয়। সহল তস্তরী বলেন ঃ তিন ব্যক্তির সংসর্গ থেকে বেঁচে থাকা উচিত– প্রথম, অত্যাচারী গাফেলের কাছ থেকে; দ্বিতীয়, দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শনকারী আলেমের কাছ থেকে এবং তৃতীয়, মূর্খ সুফীর কাছ থেকে।

এখন জানা উচিত, সংসর্গের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শর্তসমূহ নির্ধারিত হবে। কেননা, আখেরাতের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে

সংসর্গের যেসকল শর্ত রয়েছে, সেগুলো দুনিয়ার উদ্দেশ্য হাসিলের শর্ত থেকে ভিন্নতর হবে। সেমতে বিশর বলেন ঃ ভাই তিন প্রকার। এক, আখেরাতের জন্যে, এক দুনিয়ার জন্যে এবং এক চিত্ত বিনোদনের জন্যে। এক ব্যক্তির মধ্যে সবগুলো বিষয় কমই থাকে। বরং এগুলো কয়েক ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। অতএব তাদের মধ্যে শর্তও বিভিন্ন হওয়া জরুরী। কথিত আছে, মানুষ বৃক্ষ এবং উদ্ভিদসদৃশ। কোন কোন বৃক্ষ ছায়া দান করে; কিন্তু ফল দেয় না। তারা এমন লোক, যাদের কাছ থেকে দুনিয়া আখেরাত কোথাও উপকার পাওয়া যায় না। কেননা, দুনিয়ার উপকার-অপকার অপসৃয়মান ছায়ার ন্যায় দ্রুত লোপ পায়। কতক বৃক্ষ ফল দেয় কিন্তু ছায়া দেয় না। এগুলো সেই লোকদের মত, যারা পরকালের কাজে আসে– দুনিয়ার কোন কাজে আসে না। কতক বৃক্ষ থেকে ফল ও ছায়া উভয়টিই পাওয়া যায়। কতক বৃক্ষ ফল ছায়া কোনটিই দেয় না; যেমন বাবলা বৃক্ষ। এটা কেবল কাপড় ছিন্ন করে– খাওয়াও যায় না, পানও করা যায় না। জন্তুদের মধ্যে এর মত রয়েছে ইঁদুর ও বিচ্ছু এবং মানুষের মধ্যে তারা, যাদের দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার কোন উপকার হয় না; বরং মানুষকে কেবল পীড়াই দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ -

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, কেউ যদি এমন সহচর না পায়, যার সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলীর কোন একটি অর্জন করা যায়, তবে তার জন্যে একাকিত্বই উত্তম। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ যাদের সামনে মানুষ লজ্জাবোধ করে, তাদের কাছে বসে তোমার এবাদত পুনরুজ্জীবিত কর। হযরত ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন ঃ আমাকে এমন লোকদের সংসর্গই বিপদে ফেলেছে, যাদের সামনে আমি লজ্জা করতাম না। ওসমান বলেন ঃ বৎস, আলেমগণের কাছে বস এবং তাদের হাঁটুর সাথে হাঁটু মেলাও। কেননা, অন্তর এলেম ও হেকমত দ্বারা এমনভাবে সজীব হয়, যেমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হলে মৃত মাটি জীবিত হয়ে উঠে। এখন আমরা সংসর্গের কর্তব্য ও অপরিহার্য বিষয়সমূহ যথাযথ পালন করার উপায় লিপিবদ্ধ করছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সাহচর্য ও বন্ধুত্বের কর্তব্য

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহ যেমন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটি বন্ধন; তেমনি ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্বও দু'ব্যক্তির মধ্যে একটি বন্ধন। বিবাহের মধ্যে যেমন কতিপয় হক আদায় করা ওয়াজিব, তেমনি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনেও কিছু হক তামিল করা জরুরী। উদাহরণতঃ যার সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করবে, তোমার উপর তার মোটামুটি আট প্রকার হক থাকবে। প্রথম হক তোমার ধন-সম্পদে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ দু'ভাই দু'হাত সদৃশ, যার একটি অপরটিকে ধৌত করে। এখানে দু'হাত সদৃশ বলা হয়েছে, পা সদৃশ বলা হয়নি। কেননা, উভয় হাত একই উদ্দেশ্য সাধনে একে অপরের সাহায্য করে। অনুরূপভাবে উভয় ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব তখন পূর্ণাঙ্গ হয়, যখন তারা একই লক্ষ্য অর্জনে একে অপরকে সঙ্গ দেয়। ফলে তারা যেন একাত্ম হয়ে যায়। এই একত্বের দাবীস্বরূপ তারা লাভ-লোকসান ও আপদে বিপদে একে অপরের শরীক হবে।

ধন-সম্পদ দ্বারা বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করার তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্নস্তর হচ্ছে বন্ধুকে খাদেম ও পরিচারক মনে করা এবং নিজের বাড়তি সম্পদের মাধ্যমে তার দেখাশুনা করা। সুতরাং যখন বন্ধুর প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তোমার কাছে অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থাকে, তখন চাওয়া ছাড়াই তা তার হাতে সমর্পণ কর। এমতাবস্থায় যদি চাওয়ার দরকার হয়, তবে ভ্রাতৃত্বের কর্তব্য পালনে তুমি ত্রুটি করেছ বলতে হবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে বন্ধুকে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনে করা এবং ধন-সম্পদে তার শরীকানা পছন্দ করা; এমন কি, নিজের ধন-সম্পদ আধাআধি বন্টন করে দেয়া। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তীগণ বন্ধুর সাথে এরূপ ব্যবহারই করতেন। তাঁরা একটি চাদর পর্যন্ত দ্বিখন্ডিত করে অর্ধেক নিজে রাখতেন এবং অর্ধেক বন্ধুকে দিয়ে দিতেন। তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে বন্ধুকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং তার প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের অগ্রে স্থান দেয়া, এটা সিদ্দীকগণের স্তর। এ স্তরের পূর্ণতা হচ্ছে অপরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া। বর্ণিত আছে, একবার খলীফার সামনে কয়েকজন সুফীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হলে খলীফা

সকলের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এই সুফীগণের মধ্যে আবুল হোসাইন নূরী (রহঃ)-ও ছিলেন। তিনি সবার আগে জল্লাদের সামনে গেলেন এবং বললেন ঃ সর্বপ্রথম আমাকে হত্যা কর। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ আমি এই মুহূর্তে আমার ভাইদের জীবনকে আমার জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে চাই। এই উক্তির কারণে খলীফা সকলকে মুক্ত করে দিলেন।

যদি উপরোক্ত তিনটি স্তরের কোন একটি স্তর তুমি তোমার বন্ধুর সাথে অর্জন করতে না পার, তবে বুঝে নেবে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এখনও তোমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং তুমি কেবল সাধারণ নিয়ম ও প্রথা অনুযায়ী মানুষের সাথে মেলামেশা করে যাচ্ছ। বিবেক ও ধর্মের দৃষ্টিতে এটা মোটেই ধর্তব্য নয়। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন ঃ যে ব্যক্তি বন্ধুকে বাহুল্য মনে করে না, সে এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করুক, যার হাত আল্লাহ কবুল করেন। পূর্ববর্তী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সর্বনিম্ন স্তরও পছন্দ করতেন না। বর্ণিত আছে, ওতবা তাঁর বন্ধুর গৃহে এসে বললেন ঃ তোমার ধন-সম্পদ থেকে এখন চার হাজার দেরহাম আমার প্রয়োজন। বন্ধু বলল ঃ দু'হাজার নিয়ে যাও। এতে ওতবা মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ তুমি দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছ। তোমার লজ্জা করা উচিত, আল্লাহর জন্যে বন্ধুত্বের দাবী করে একথা বলছ। যে ব্যক্তি ভ্রাতৃত্বের সর্বনিম্ন স্তরের অধিকারী, তার সাথে দুনিয়ার কাজ কারবার করা উচিত নয়। আবু হাযেম বলেন ঃ তোমার আল্লাহর ওয়াস্তে কোন ভাই থাকলে তার সাথে পার্থিব কাজ কারবার করো না। এখানে উদ্দেশ্য সে ব্যক্তি, যে ভ্রাতৃত্বের সর্বনিম্নস্তরের অধিকারী। ভ্রাতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরের কারণেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে মুমিনের প্রশংসা করেছেন–

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ অর্থাৎ, তাদের ব্যাপারাদি তাদের মধ্যে পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয় এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা তারা ব্যয় করে। অর্থাৎ, তাদের ধন-সম্পদ মিশ্রিত ছিল। কেউ নিজের আসবাবপত্র অন্যের কাছ থেকে আলাদা রাখত না। জনৈক বুযুর্গ এমন ছিলেন যে, কেউ "আমার জুতা" বললে তিনি তার সঙ্গ পরিত্যাগ করতেন। ফাতাহ মুসেলী তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী গেলেন। বন্ধু বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে টাকার সিন্দুক আনতে

বললেন। অতঃপর তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থ সিন্দুক থেকে নিয়ে চলে গেলেন। গৃহকর্তা বাড়ী ফিরে এলে বাঁদী তাকে ঘটনা বলল। বন্ধু আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ যতি তোর কথা সত্য হয়, তবে তুই আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল ঃ আমি আপনার সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব করতে চাই। তিনি বললেন ঃ তুমি এই ভ্রাতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত আছ কি? সে আরজ করল ঃ আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন ঃ এই ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের পর তুমি তোমার দীনার ও দেরহামে আমার চেয়ে অধিক হকদার থাকবে না। লোকটি বলল ঃ আমি এখন পর্যন্ত এই স্তরে পৌঁছতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ তা হলে আমার কাছ থেকে বিদায় নাও।

ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইয়ের পকেটে অথবা থলেতে হাত ঢুকিয়ে যা ইচ্ছা তা তার অনুমতি ছাড়া নেয় কিনা? লোকটি আরজ করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তা হলে তোমরা ভাই ভাই নও। কিছু লোক হযরত হাসান বসরীর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আপনি কি নামায পড়ে নিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। লোকেরা বলল ঃ বাজারের লোকেরা তো এখনও পড়েনি। তিনি বললেন ঃ বাজারের লোকদের কাছ থেকে ধর্মের রীতিনীতি কে শিক্ষা করে? আমি তো আরও শুনেছি, তাদের কেউ তার ভাইকে দেরহাম দেয় না। একথাটি তিনি বিস্ময়ভরে বললেন। জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম আদহামের খেদমতে উপস্থিত হল। তিনি তখন বায়তুল মোকাদ্দাস গমনে উদ্যত ছিলেন। লোকটি আরজ করল ঃ আমি আপনার সঙ্গী হতে চাই। তিনি বললেন ঃ এই শর্তে হতে পারে যে, তোমার দ্রব্য-সামগ্রীতে আমার ক্ষমতা তোমার চেয়ে বেশী হবে। লোকটি বলল ঃ এটা আমি পছন্দ করি না। তিনি বললেন ঃ তোমার সত্য কথায় আমি প্রীত হলাম। বর্ণিত আছে, কেউ তাঁর সঙ্গী হলে সঙ্গী তাঁর মর্জির বিপক্ষে কিছু করত না। তিনিও মর্জিমাফিক ব্যক্তিকেই সঙ্গে নিতেন। একবার এক ব্যক্তিকে পদব্রজে পথ চলতে দেখে হযরত ইবরাহীম আদহাম আপন সঙ্গীর গাধাটি তার অনুমতি ছাড়াই তাকে দিয়ে দিলেন। সঙ্গী এসে বিষয়টি জানতে পেরে চুপ করে রইল এবং খারাপ মনে করল না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক সাহাবীর কাছে হাদিয়াস্বরূপ ছাগলের মস্তক এলে তিনি চিন্তা করলেন, আমার অমুক ভাই এ জিনিসটির অধিক

মুখাপেক্ষী। সেমতে তিনি মস্তকটি তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তৃতীয় একজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে মস্তকটি সাত জনের হাত ঘুরে পুনরায় প্রথম সাহাবীর হাতেই গেল। বর্ণিত আছে হযরত মসরুক একবার মোটা অংকের টাকা ধার করেন। তাঁর বন্ধু খায়সামা ঋণগ্রস্ত ছিলেন। তিনি গিয়ে খায়সামার অজান্তে তার ঋণ শোধ করে দেন। এর পর খায়সামা গোপনে হযরত মসরূকের ঋণ শোধ করে দেন। যখন রসূলে করীম (সাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও সাদ ইবনে রবীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন, তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ তার নিজের ও তার ধন-সম্পদের মধ্যে ক্ষমতা দিয়ে বললেন ঃ এগুলো তোমার, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। হযরত সা'দ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এগুলোতে বরকত দান করুন। অতঃপর এগুলো কবুল করে তিনি তাই করলেন, যা হযরত আবদুর রহমান করেছিলেন। এখানে হযরত সা'দের কাজটি ছিল সমতা আর হযরত আবদুর রহমান প্রথমে যা করেছিলেন, তা ছিল আত্মত্যাগ। এতদুভয়ের মধ্যে আত্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ। হযরত আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে সমস্ত দুনিয়া আমার হস্তগত হয়ে যায় এবং আমি তা কোন বন্ধুর মুখে দিয়ে দেই, তবে একেও আমি তার জন্যে কমই মনে করব। এটাও তাঁরই উক্তি, আমি খাদ্যের লোকমা তো কোন বন্ধুকে খাওয়াই বটে, কিন্তু তার স্বাদ আমার গলায় অনুভব করি। বন্ধুদের জন্যে ব্যয় করা ফকীরদের জন্যে ব্যয় করার চেয়ে উত্তম বিধায় হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ বিশ দেরহাম কোন বন্ধুকে দেয়া আমার কাছে একশ' দেরহাম কোন ফকীরকে খয়রাত করা অপেক্ষা উত্তম। এটাও তাঁরই উক্তি, যদি আমি এক সা' খাদ্য তৈরী করে বন্ধুদেরকে আমন্ত্রণ করি, তবে এটা আমার কাছে একটি গোলাম মুক্ত করার চেয়ে ভাল।

বলাবাহুল্য, আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে সকলেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরই অনুসরণ করে থাকেন। তাঁর নীতি তাই ছিল। সেমতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার এক সাহাবীর সাথে জঙ্গলে তশরীফ নিয়ে যান এবং সেখানে দু'টি মেসওয়াক চয়ন করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল সোজা অপরটি বাঁকা। তিনি সোজা মেসওয়াকটি সাহাবীকে দিয়ে দিলে সাহাবী আরজ করলেন ঃ আমার তুলনায় আপনি এর অধিক হকদার। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ

করলেন ঃ যে ব্যক্তি তার বন্ধুর সাথে এক মুহূর্তও থাকে, তাকে সংসর্গের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, সে এতে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করেছিল কিনা? এ হাদীসে এরশাদ হয়েছে, সংসর্গে স্বার্থত্যাগ করা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার হক আদায় করা। অন্য এক দিন রসূলে করীম (সাঃ) এক কূপে গোসল করতে গেলেন। হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান একটি চাদর দিয়ে তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। তাঁর গোসল সমাপ্ত হলে হুযায়ফা গোসল করতে বসলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাদর হাতে নিয়ে তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলেন। হুযায়ফা (রাঃ) আরজ করলেন ঃ আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক– আপনি এরূপ করবেন না, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানলেন না। তিনি গোসল শেষ হওয়া পর্যন্ত চাদর দিয়ে আড়াল করে রইলেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ যখন দু'ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গী হয়, তখন তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অদিক প্রিয় সেই হয়, যে তার সঙ্গীর সাথে অধিক কোমল হয়। বর্ণিত আছে, মালেক ইবনে দীনার ও মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে, হযরত হাসান বসরীর গৃহে এমন এক এক সময় গিয়ে হাযির হলেন যখন তিনি গৃহে ছিলেন না। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' হযরত হাসানের চৌকির নীচে থেকে একটি খাদ্য ভর্তি পিয়ালা বের করে খেতে লাগলেন। মালেক ইবনে দীনার বললেন ঃ যে পর্যন্ত গৃহকর্তা না আসে, তোমার এ খাদ্য খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' তাঁর কথা মানলেন না, খেতে থাকলেন। ইতিমধ্যে হযরত হাসান বসরী গৃহে ফিরে এসে বললেন ঃ মালেক, পূর্বে আমাদের অবস্থা এমনি ছিল। আমরা ছিলাম পরস্পরের অকপট ও অকৃত্রিম বন্ধু। তোমাদের ও তোমাদের সমসাময়িকদের জন্মগ্রহণ পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বন্ধুদের গৃহে লৌকিকতা না করা স্বচ্ছ বন্ধুত্বের পরিচায়ক।

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন ঃ اَوْمَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗ اَوْ صَدِيْقِكُمْ অর্থাৎ, তার গৃহ থেকে খাওয়া তোমাদের জন্যে গোনাহ নয়, যার চাবির মালিক তোমরা হয়েছ, অথবা বন্ধুর গৃহ থেকে।

পূর্ববর্তীদের রীতি ছিল, তারা আপন গৃহের চাবি বন্ধুর হাতে দিয়ে দিতেন এবং যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার তাকে দান করতেন, কিন্তু বন্ধু তাকওয়ার কারণে তাদের সম্পদ থেকে খেত না। অবশেষে

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করে বন্ধুদের মালে খোলামেলা ব্যবহার করার অনুমতি দান করলেন।

বন্ধুর দ্বিতীয় হক হচ্ছে সওয়াল করার পূর্বে তার অভাব দূর করা এবং নিজের বিশেষ প্রয়োজনের উপর তার প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে সাহায্য করা। বন্ধুকে সাহায্য করার কয়েকটি স্তর আছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে সওয়াল করার সময় তার প্রয়োজন মেটানো এবং হাসিমুখে ও খুশী মনে তা করা। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যখন তুমি কোন বন্ধুর সামনে নিজের প্রয়োজন পেশ কর এবং সে তা পূর্ণ করে না, তখন পুনরায় তাকে স্মরণ করিয়ে দাও। সম্ভবতঃ সে ভুলে গেছে। যদি এর পরও পূর্ণ না করে; তবে তার উপর আল্লাহু আকবার বলে এই আয়াত পাঠ করে নাও– وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ الاية অর্থাৎ, সে এবং মৃত ব্যক্তি এমতাবস্থায় সমান।

ইবনে বাশরামা তার বন্ধুর একটি বড় কাজ করে দিলে বন্ধু তার কাছে কিছু উপঢৌকন নিয়ে হাযির হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কেন? বন্ধু বলল ঃ এটা এজন্যে যে, আপনি আমার একটি বড় কাজ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সালামতে রাখুন; তোমার সম্পদ তোমার কাছেই রাখ। তুমি যখন কোন বন্ধুর সামনে নিজের প্রয়োজনের কথা বল, তখন সে যদি তা পূর্ণ করতে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা না করে, তা হলে ওযু করে তার উপর জানাযার নামায পড়ে নাও এবং তাকে মৃত মনে কর। হযরত জা'ফর সাদেক (আঃ) বলেন ঃ আমি আমার শত্রুদের অভাব-অনটন অনতিবিলম্বে পূর্ণ করি। কেননা, আমার আশংকা হয়, তাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে তারা আমার প্রতি বেপরওয়া হয়ে যাবে। শত্রুদের সাথে এই ব্যবহার হলে বন্ধুদের সাথে কিরূপ হবে, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। পূর্ববর্তীগণের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন, যাঁরা বন্ধুর পরিবারবর্গের দেখাশুনা তার মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত করতেন; তাদের অভাব-অনটন দূর করতেন এবং প্রত্যহ তাদের কাছে গিয়ে নিজের অর্থকড়ি ব্যয় করতেন। ফলে মৃতের এতীম শিশুরা কেবল নিজের পিতাকে চোখে দেখত না; কিন্তু তার স্নেহ-মমতা বিদ্যমান পেত। সত্যি কথা বলতে কি, যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ফলাফল এরূপ নয়, তাতে কোন কল্যাণ নেই। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন ঃ যে ব্যক্তির বন্ধুত্বে তোমার উপকার হয় না, তার শত্রুতাও তোমার জন্যে

ক্ষতিকর নয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ সাবধান, পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার কিছু পাত্র আছে, তা হচ্ছে অন্তর। সে পাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয়, যা সর্বাধিক পরিষ্কার, অধিক শক্ত এবং অধিক নরম। অধিক পরিষ্কার গোনাহের ব্যাপারে, অধিক শক্ত ধর্মকর্মে এবং অধিক নরম ভাই-বন্ধুদের ক্ষেত্রে।

সারকথা, তোমার কাছে তোমার ভাইয়ের প্রয়োজন তোমার নিজের প্রয়োজনের মত হয়ে যাওয়া উচিত; বরং তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যেমন নিজের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল হও না, তেমনি বন্ধুর অবস্থা সম্পর্কে গাফেল হবে না। তার সওয়াল ও প্রয়োজন ব্যক্ত করার দরকার নেই। তাকে এমনভাবে সাহায্য কর যেন তুমি জানই না যে, সাহায্য করছ। সে যে তোমার সাহায্য কবুল করে, এজন্যে তার কাছে কৃতজ্ঞ থাক। কেবল অভাব দূর করেই ক্ষান্ত থেকো না; বরং চেষ্টা কর যাতে সম্মান প্রদর্শন ও ত্যাগ স্বীকারের সূচনা তোমার পক্ষ থেকে হয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলতেন ঃ আমার বন্ধু আমার কাছে সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের চেয়েও অধিক প্রিয়। কারণ, পরিবার-পরিজন আমাকে সংসারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আর বন্ধু আখেরাতের কথা অন্তরে জাগরিত করে।

তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার বন্ধুকে বিদায় দেয়ার সময় তার পেছনে কিছুদূর চলে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন কয়েকজন ফেরেশতাকে জান্নাত পর্যন্ত তার পেছনে চলার জন্যে আরশের নীচ থেকে প্রেরণ করবেন। হযরত আতা (রহঃ) বলেন ঃ তিন অবস্থায় তুমি তোমার বন্ধুর খবর নাও– পীড়িত হলে তার সেবাযত্ন কর, কাজে ব্যস্ত থাকলে তাকে সাহায্য কর এবং বিস্মৃত হলে স্মরণ করিয়ে দাও। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ডানে-বামে তাকিয়ে কাউকে যেন খুঁজছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি আরজ করলেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে মহব্বত করি। তাকে দেখতে পাচ্ছি না। রসূলে পাক (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা যখন কাউকে মহব্বত কর, তখন তার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করে নাও। এর পর সে অসুস্থ হলে তার সেবা শুশ্রূষা কর এবং কাজে ব্যস্ত থাকলে সাহায্য কর। হযরত শা'বী বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যের সাথে উঠাবসা করে, এর পর বলে, আমি তার মুখাকৃতি চিনি; কিন্তু নাম জানি না; এ ধরনের পরিচয়

নির্বোধদের। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার মতে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ যে আমার সাথে উঠাবসা করে। তিনি আরও বলেন ঃ যে আমার মজলিসে তিন বার আসে, আমি বুঝতে পারি, তার প্রতিদান দুনিয়ার দ্বারা হবে না। সায়ীদ ইবনে আছ (রাঃ) বলেন ঃ যে আমার সাথে উঠা বসা করে, আমার কাছে তার হক তিনটি– আমার কাছে থাকলে তাকে মারহাবা বলা, কথা বললে তা মনোযোগ দিয়ে শুনা এবং কাছে বসলে তাকে ভালরূপে জায়গা দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (তারা পরস্পরে দয়াশীল।) এতেও পারস্পরিক দয়া, মমতা ও সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্নেহ ও অনুগ্রহের পরিশিষ্ট হল কোন সুস্বাদু খাদ্য একা না খাওয়া এবং তাকে ছাড়া কোন আনন্দ মজলিসে যোগদান না করা; বরং তার বিরহে বিষণ্ন ও আতংকগ্রস্ত থাকা।

বন্ধুর তৃতীয় হক হচ্ছে, কয়েকটি স্থানে নিশ্চুপ থাকা এবং মুখ না খোলা। প্রথম, তার দোষ তার সামনে বা পেছনে বর্ণনা না করা; বরং দোষত্রুটি সম্পর্কে না জানার ভান করা। দ্বিতীয়, তার কথা খন্ডন না করা। তৃতীয়, তার অবস্থা অন্বেষণ না করা। তাকে পথিমধ্যে অথবা কোন কাজে দেখা গেলে এবং সে কোথায় থেকে আসছে এবং কোথায় যাচ্ছে– এসব বিষয় নিজে বর্ণনা না করলে তাকে জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে চুপ থাকবে। কেননা, মাঝে মাঝে তা বর্ণনা করা তার পক্ষে কঠিন হতে পারে অথবা ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হতে পারে। চতুর্থ, বন্ধু যেসব গোপন কথা তোমার কাছে বলেছে সেগুলো ফাঁস করা থেকে বিরত থাকবে; অন্য কারও কাছে কখনও বলবে না। এমন কি, নিজের অথবা তার বন্ধুর কাছেও না। বন্ধুত্ব শেষ হয়ে গেলেও তার গোপন কথা ফাঁস করা আন্তরিক ভ্রষ্টতার লক্ষণ। পঞ্চম, বন্ধুর আপনজন, আত্মীয়স্বজন ও পরিবার-পরিজনকে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকবে। ষষ্ঠ, কেউ তাকে গালি দিলে তার সামনে সেই গালির কথা বলবে না। কেননা, গালি যেন সেও দেয়, যে মুখের উপর তা উদ্ধৃত করে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কারও সামনে এমন কথা উদ্ধৃত করতেন না, যা তার অপ্রিয়। কথা উদ্ধৃতকারী দ্বারা প্রথমে কষ্ট হয়, এর পর আসল বক্তা দ্বারা। অন্য কেউ বন্ধুর প্রশংসা করলে তা গোপন করা উচিত নয়। কেননা, প্রথমে আনন্দ উদ্ধৃতকারীর দ্বারা হয়, এর পর প্রকৃত বক্তা দ্বারা। এছাড়া

প্রশংসা গোপন করা হিংসার অন্তর্ভুক্ত। মোট কথা, বন্ধুর অপ্রিয় বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে নিরব থাকা উচিত। বন্ধুর নিন্দাও দোষ এবং তার পরিবারের দোষ বর্ণনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে হারাম। দু'টি বিষয় চিন্তা করলে তুমি তোমার বন্ধুর দোষ বর্ণনা করার জন্যে মুখ খুলবে না। প্রথমত তুমি নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা কর। যদি তাতে কোন দোষ দেখ, তবে বন্ধুর দোষকে অসহনীয় মনে করো না। তুমি মনে কর, যেমন আমি একটি দোষ করার ব্যাপারে অপারগ এবং তা বর্জন করতে অক্ষম, তেমনি সে-ও হয়ত একটি অভ্যাসে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। সম্পূর্ণ দোষমুক্ত মানুষ কোথায়? আর যদি তুমি বন্ধুকে সকল দোষ থেকে মুক্তই দেখতে চাও, তবে মানুষ থেকে দূরে চলে যাও এবং কারও সংসর্গ অবলম্বন করো না। কেননা, জগতে যত মানুষ আছে, তাদের মধ্যে দোষও আছে, গুণও আছে। কারও গুণ বেশী থাকলে তাকেই সংসর্গের জন্যে উত্তম মনে করে নাও। মোট কথা, ভদ্র ঈমানদার ব্যক্তি সর্বদা নিজের বন্ধুর গুণাবলীই দৃষ্টিতে রাখে, যাতে অন্তর থেকে তার প্রতি বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব অংকুরিত হয়। পক্ষান্তরে কপট ও নীচ ব্যক্তি সর্বদা দোষ ত্রুটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

হযরত ইবনে মোবারক (রাহঃ) বলেন ঃ ঈমানদার ওযর তালাশ করতে থাকে এবং কপট ভুলভ্রান্তি অন্বেষণ করে। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ বন্ধুদের ত্রুটি ক্ষমা করা মহত্ত্ব। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

استعيذوا بالله من جار السوء الذى ان راى خيرا ستره وان راى شرا ظهره ـ

অর্থাৎ, মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সে ভাল কাজ দেখলে তা গোপন করে এবং মন্দ দেখলে প্রকাশ করে দেয়।

এমন কোন লোক নেই, যাকে কয়েকটি গুণের কারণে ভাল বলা যাবে না। অনুরূপভাবে তাকে মন্দও বলা যায়। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। পরবর্তী দিন তারই নিন্দা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কাল তুমি তার প্রশংসা করেছিলে, আজ নিন্দা করছ? সে আরজ করল ঃ কালও আমি

তার সম্পর্কে সত্য বলেছিলাম এবং আজও মিথ্যা বলছি না। সে কাল আমাকে সন্তুষ্ট রেখেছিল। তাই তার যেসব গুণ আমার জানা ছিল, সেগুলো বর্ণনা করেছি, কিন্তু আজ সে আমাকে অসন্তুষ্ট করেছে। তাই তার যেসব দোষ আমি জানতাম, সেগুলো বর্ণনা করছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ان من البيان لسحرا (কোন কোন বর্ণনা জাদুতুল্য)। বিষয়টিকে তিনি খারাপ মনে করেই জাদুর সাথে তুলনা করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে– البذاء والبيان شعبتان من النفاق (অশ্লীল কথাবার্তা ও বাকচাতুর্য মোনাফেকীর দুটি শাখা)। আরও বলা হয়েছে– ان الله يكره لكم البيان كل البيان (আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে বাকচাতুর্য অপছন্দ করেন)।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে কেবল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যই করে এবং কোন গোনাহ করে না। পক্ষান্তরে এমনও কেউ নেই, যে কেবল নাফরমানীই করে– আনুগত্য করে না। অতএব যার আনুগত্য নাফরমানীর উপর প্রবল, সেই আদেল। আল্লাহ তাআলার হকের ব্যাপারে এরূপ ব্যক্তি যখন আদেল সাব্যস্ত হয়, তখন তুমি যদি নিজের হকের ব্যাপারে এরূপ ব্যক্তিকে আদেল মনে কর, তবে এটা অধিক বাঞ্ছনীয় নয় কি? বন্ধুর দোষত্রুটি বর্ণনা করার ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা যেমন ওয়াজিব, তেমনি অন্তর দিয়ে নিশ্চুপ থাকাও ওয়াজিব। অর্থাৎ, তার প্রতি অন্তরে কুধারণা ঘোষণা করা অন্তরের গীবত। এটাও শরীয়তে নিষিদ্ধ। এর চূড়ান্ত পর্যায়, যে পর্যন্ত বন্ধুর কাজকে ভাল অর্থে নেয়া সম্ভবপর হয়, সেই পর্যন্ত তা খারাপ অর্থে নেয়া উচিত নয়, কিন্তু যে দোষ নিশ্চিত ও প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ পায় তা তাকে বলা গেলেও যথাসম্ভব সেটি ভুলক্রমে হয়েছে বলে ধরে নেয়া জরুরী।

কুধারণা দু'প্রকার। এক, লক্ষণ বিদ্যমান থাকার কারণে কুধারণা হওয়া। এরূপ কুধারণা মানুষ মন থেকে দূর করতে পারে না। দুই, কুবিশ্বাসপ্রসূত কুধারণা। উদাহরণতঃ বন্ধু এমন কোন কাজ করল, যা ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে, কিন্তু তার প্রতি তোমার বিশ্বাস ভাল নয় বিধায় তুমি কাজটিকে খারাপ অর্থেই ধরে নিচ্ছ। অথচ কোন লক্ষণ বিদ্যমান নেই, যদ্দ্বারা কাজটি খারাপ হতে পারে। এ ধরনের কুধারণা

অন্তরের নষ্টামি বৈ কিছু নয় এবং এটা কেবল বন্ধুর বেলায়ই নয়, যে কোন মুসলমান সম্বন্ধে এরূপ কুধারণা পোষণ করা হারাম। তাই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

ان الله قد حرم على المؤمن دمه وماله وعرضه وان يظن به ظن السوء ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মুমিনের উপর অন্য মুমিনের রক্ত, ধনসম্পদ, মান-সম্মান ও তার প্রতি কুধারণা পোষণ হারাম করেছেন।

তিনি আরও বলেন ঃ فان الظن اكذب الحديث (তোমরা কুধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, কুধারণা অধিকতর মিথ্যা বিষয়)। কুধারণার ফলস্বরূপ মানুষ গোপনে অন্যের অবস্থা সম্পর্কে ঘাঁটাঘাঁটি করে এবং অলক্ষ্যে তার কর্মকাণ্ডের প্রতি নজর রাখে। অথচ রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

ولاتجسسوا ولا تحسسوا ولاتقاطعوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ـ

অর্থাৎ. তোমরা একে অপরের গোপন তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করো না। একে অপরের পেছনে লেগে থেকো না, পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ো না এবং আল্লাহর সমস্ত বান্দা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।

এ থেকে জানা গেল, দোষক্রটি গোপন করা এবং তা না জানার ভান করা ধর্মপরায়ণদের অভ্যাস। দোষ গোপন করা এবং সদগুণ প্রকাশ করার ফযীলতের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, দোয়া মাসুরায় আল্লাহ তাআলাকে এসব গুণে গুণান্বিত করে বলা হয়েছে– يا من اظهر بالجميل وستر القبيح অর্থাৎ, যিনি সদগুণ প্রকাশ করেন এবং দোষ গোপন করেন। বলাবাহুল্য, আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়াকেই আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। তিনি যখন দোষ গোপন করেন এবং বান্দার গোনাহ ক্ষমা করেন, তখন তুমি এরূপ ব্যক্তিকে কিরূপে ক্ষমা করবে না, যে তোমার সমপর্যায়ভুক্ত অথবা তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান এবং কোন অবস্থাতেই তোমার গোলাম অথবা সৃষ্ট নয়। একবার হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর অনুচরবর্গকে বললেন ঃ যখনা তোমরা তোমাদের কোন ভাইকে

নিদ্রাবস্থায় দেখ এবং বাতাস তার উপর থেকে বস্ত্র উড়িয়ে নেয়, তখন তোমরা কি কর? তারা নিবেদন করল ঃ আমরা তাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে দেই। তিনি বললেন ঃ না, বরং তোমরা তার গুপ্তাঙ্গ উন্মুক্ত করে দাও। অনুচররা আরজ করল ঃ সোবহানাল্লাহ্! কে এরূপ করে? তিনি বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নিজের ভাই সম্পর্কে কোন কথা শুনে, তখন তার সাথে অন্য আরও খারাপ কথা মিলিয়ে দেয়। খবরদার! ততক্ষণাৎ পর্যন্ত মানুষের ঈমান কামেল হয় না যে পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের জন্যে তা-ই পছন্দ না করে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করে। ভ্রাতৃত্বের সর্বনিম্ন স্তর হল অন্যের কাছে যে ব্যবহার প্রত্যাশা করবে, আপন ভাইয়ের সাথে সেই ব্যবহার করা। বলাবাহুল্য, মানুষ অন্যের কাছে এমনি প্রত্যাশা করে যে, সে তার দোষক্রটি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিক। এই প্রত্যাশার পরিপন্থী কর্ম কারও কাছ থেকে প্রকাশ পেলে তাকে লাল চোখ দেখানো হয়। অতএব এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, নিজে অন্যের কাছে চোখ ফিরিয়ে নেয়া আশা করবে; কিন্তু অন্যের দোষ দেখে সে তা গোপন করবে না! এরূপ বে-ইনসাফের জন্যে কোরআনে অভিসম্পাত বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, অভিসম্পাত মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের জন্যে, যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।

যার মন অন্যের জন্যে যতটুকু ইনসাফ পছন্দ করে, অন্যের কাছ থেকে তার চেয়ে বেশী ইনসাফ পেতে চায়, সে এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের অন্তর্নিহিত একটি রোগই অন্যের দোষ গোপনে ক্রটি করার মূল কারণ। হিংসা-বিদ্বেষ মানুষের অন্তরকে নষ্টামিতে পরিপূর্ণ করে দেয়। এগুলো তার অন্তরে সুযোগ না হওয়া পর্যন্ত চাপা ও বন্দী থাকে। সুযোগ পেলেই বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং লজ্জা শরমের বাধা অপসারিত হয়। তখনই অন্তরের ভ্রষ্টামি নিঃসৃত হতে থাকে। সুতরাং যখন অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ থাকে, তখন কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব করা উচিত নয়। বরং আলাদা থাকা উত্তম। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ ভাইদের সাথে বাহ্যতঃ

রাগারাগি করা অন্তরে হিংসা-দ্বেষ রাখার চেয়ে উত্তম। যার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা থাকে, তার ঈমান দুর্বল এবং তার ব্যাপারটি বিপজ্জনক। এরূপ অন্তর খোদায়ী দীদারের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আবদুর রহমান ইবনে জুবায়র তাঁর পিতার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তিনি ইয়ামনে থাকাকালে তাঁর প্রতিবেশী ছিল জনৈক ইহুদী। সে তাঁর কাছে তওরাতের বিষয়াদি বর্ণনা করত। একদিন ইহুদী সফর থেকে ফিরে এলে তিনি তাকে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে মুসলমান হতে বললে আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। আমাদের জন্যে একটি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা তওরাতের সত্যায়ন করে। ইহুদী বলল ঃ তুমি সঠিক বলছ, কিন্তু তোমাদের পয়গম্বর যে বিধান এনেছেন, তা তোমরা পালন করতে পারবে না। আমরা এই পয়গম্বর এবং তাঁর উম্মতের পরিচয় তওরাতে এভাবে পাই যে, কোন ব্যক্তি তার অন্তরে বিদ্বেষ রেখে দরজার চৌকাঠের বাইরে পা রাখবে না। নিজের কাছে গচ্ছিত ভেদ ফাঁস না করাও একটি মৌখিক হক। প্রয়োজনবোধে- অমুক কোন গোপন কথা আমাকে বলেনি বলে অস্বীকার করাও জায়েয। এটা মিথ্যা হলেও এরূপ ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা ওয়াজিব নয়। নিজের দোষত্রুটি ও ভেদের কথা গোপন করা মিথ্যা বলার মাধ্যমে হলেও যেমন জায়েয, তেমনি বন্ধুর খাতিরে এতটুকু পাপ করাও বৈধ। কেননা, বন্ধু নিজেরই স্থলাভিষিক্ত; যেন এক প্রাণ দু'দেহ। এটাই বন্ধুত্বের স্বরূপ। তাই বন্ধুকে দেখিয়ে কোন আমল করলে তাতে রিয়া হবে না এবং আমলটি আন্তরিক আমল থেকে বের হয়ে বাহ্যিক আমল হয়ে যাবে না। কেননা, বন্ধুর আমল জানা নিজের আমল জানার মতই। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من ستر عورة اخيه ستره الله تعالى فى الدنيا والاخرة ـ

যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে-

من ستر عورة اخيه فكانما احيا مؤودة

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ গোপন করে, সে যেন কবরে প্রোথিতকে জীবিত করে। আরও বলা হয়েছে-

اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو امانة ـ

অর্থাৎ, যখন কেউ কথা বলে, অতঃপর অন্য দিকে তাকায়, তখন তার কথাটি আমানত হয়ে যায়।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, তিনটি মজলিস ছাড়া সকল মজলিসের কথাবার্তাই আমানত। প্রথম, যে মজলিসে অন্যায় খুন করা হয়। দ্বিতীয়, যে মজলিসে যিনাকে হালাল মনে করা হয়। তৃতীয়, যে মজলিসে অবৈধ উপায়ে মাল বৈধ করা হয়। এক হাদীসে আছে- যারা পরস্পরে একত্রে বসে, তারা আমানত সহকারে বসে। তারা একে অন্যের অপ্রিয় কথা প্রকাশ করবে না। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হল ঃ আপনি গোপন বিষয়সমূহের হেফাজত কিরূপে করেন? তিনি বললেন ঃ আমি গোপন বিষয়সমূহের জন্যে কবর হয়ে যাই। বলা হয়, ভাল মানুষদের বক্ষ গোপন ভেদ সমূহের কবর হয়ে থাকে। নির্বোধের মন মুখে থাকে এবং বুদ্ধিমানের জিহ্বা অন্তরে থাকে। নির্বোধ মনের কথা গোপন রাখতে পারে না- অজ্ঞাতেই প্রকাশ করে দেয়। এ কারণেই নির্বোধদের সাথে সাক্ষাৎ বর্জন, তাদের সংসর্গ, এমন কি তাদের চেহারা দর্শন থেকে পর্যন্ত বেঁচে থাকা ওয়াজিব। জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ আমি ভেদ গোপন করি এবং গোপন করার বিষয়টিও গোপন করি। ইবনুল মুরতায বলেন ঃ আমাকে কেউ কোন কথা গোপন রাখতে বললে আমি নিজের বক্ষে তাকে সমাধিস্থ করে দেই।

অন্য একজন আরও এগিয়ে গিয়ে বলেন ঃ আমার বক্ষের গোপন কথা মৃতের মত নয়। কেননা, মৃত ব্যক্তির হাশরে পুনরুত্থিত হবার আশা থাকে। বরং আমি গোপন কথা এমনভাবে বিস্মৃত হয়ে যাই, যেন সে সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যও অবগত ছিলাম না। এক ব্যক্তি তার একটি গোপন কথা তার বন্ধুকে বলে জিজ্ঞেস করল ঃ কথাটি তোমার মনে আছে? বন্ধু জওয়াব দিল ঃ না, ভুলে গেছি। আবু সায়ীদ সওরী (রহঃ) বলেন ঃ তুমি কোন ব্যক্তির সাথে ভ্রাতৃত্ব করতে চাইলে প্রথমে তাকে রাগান্বিত কর। এর পর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত কর, যাতে সে তার কাছে তোমার অবস্থা ও গোপন কথা জিজ্ঞেস করে। যদি সে তোমার সম্পর্কে ভাল বলে এবং তোমার গোপন তথ্য ফাঁস না করে, তবে তার সাথে বন্ধুত্ব কর। আবু যায়েদকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কিরূপ লোকের সংসর্গ অবলম্বন করেন? তিনি বললেন ঃ যে আমার সেই গোপন অবস্থা জানে, যা আল্লাহ তা'আলা জানেন। এর পর তা এমনভাবে গোপন করে,

যেমন আল্লাহ তা'আলা গোপন করেন। যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমাকে নিষ্পাপ দেখতে পছন্দ করে না, তার সঙ্গ লাভে কোন কল্যাণ নেই। আর যে ব্যক্তি রাগের অবস্থা গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়, সে দুরাচার। প্রসন্ন অবস্থায় বিশ্বস্ত থাকা তো প্রত্যেক সুস্থ মনেরই স্বভাব।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) একবার তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে (রাঃ) বললেন ঃ আমি দেখি, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) তোমাকে বয়োবৃদ্ধদের উপর অগ্রগণ্য মনে করেন। তাই আমি পাঁচটি বিষয় বলছি; এগুলো মনে রেখো। প্রথম, তাঁর কোন গোপন তথ্য ফাঁস করো না। দ্বিতীয়, তাঁর কাছে কারও গীবত করো না। তৃতীয়, তাঁর সামনে কোন মিথ্যা কথা বলো না। চতুর্থ, তাঁর কোন আদেশ অমান্য করো না। পঞ্চম, এমন কাজ করো না, যদ্দ্বারা তুমি তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হও।

বন্ধুর কথার মাঝখানে বাধা না দেয়াও অন্যতম মৌখিক হক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কোন নির্বোধের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ো না। সে তোমাকে নির্যাতন করবে। জ্ঞানীর কথায়ও বাধা সৃষ্টি করো না। সে তোমাকে শত্রু মনে করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে বাতিল হয়েও অন্যের কথা কাটাকাটি বর্জন করবে, তার জন্যে জান্নাতের এক প্রান্তে গৃহ নির্মিত হবে। যে ব্যক্তি হক থাকা সত্ত্বেও কথা কাটাকাটি বর্জন করবে, তার জন্যে সর্বোচ্চ জান্নাতে বাসস্থান নির্মাণ করা হবে। এটা কথা কাটাকাটি বর্জন করার সওয়াব। অথচ নিজে বাতিল হলে কথা না কেটে চুপ থাকা ওয়াজিব এবং হক হলে চুপ থাকা নফল, কিন্তু নফলের সওয়াব বেশী হওয়ার কারণ, হকের উপর থেকে চুপ থাকা অত্যন্ত কঠিন বাতিল হয়ে চুপ থাকার তুলনায়। সওয়াব কষ্ট পরিমাণে হয়ে থাকে। কথা কাটাকাটি করা দু'ভাইয়ের মধ্যে হিংসার অনল প্রজ্বলিত হওয়ার শক্তিশালী কারণ। তাই বিরোধ প্রথমে মতামতে, এর পর কথাবার্তায় এবং অবশেষে দেহের মধ্যে হয়ে থাকে। অতএব কথা কাটাকাটি যেন পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদও বটে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমরা পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করো না, পরস্পরে শত্রুতা রেখো না এবং পরস্পরকে হিংসা করো না। তিনি আরও বলেন ঃ

المسلم اخو المسلم لايظلمه ولايحرمة ولايخذله يحسب للمرء من الشر ان يحفر اخاه المسلم -

অর্থাৎ, মুসলমান মুসলমানের ভাই। তারা একে অপরকে জুলুম করে না, বঞ্চিত করে না এবং লাঞ্ছিতও করে না। ব্যক্তির জন্যে এতটুকু অনিষ্টই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে। সর্বাধিক ঘৃণা হচ্ছে কথা কেটে দেয়া। কেননা, যে অপরের কথা প্রত্যাখ্যান করে, সে হয় তাকে মূর্খ ও নির্বোধ মনে করে, না হয় তার ভ্রান্তি প্রমাণিত করে। উভয় বিষয় ঘৃণা, বিদ্বেষ ও আতংকের কারণ। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কাছে এলেন। আমরা তখন পরস্পর কথা কাটাকাটি করছিলাম। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ঃ কথা কাটাকাটি পরিহার কর। এতে মঙ্গল কম এবং ভাইদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক অক্ষম সে ব্যক্তি, যে বন্ধু অন্বেষণে ত্রুটি করে এবং এর চেয়েও অক্ষম সে ব্যক্তি, যে বন্ধু লাভ করে হারিয়ে ফেলে। বলাবাহুল্য, অধিক কথা কাটাকাটি হল বন্ধু হারানো, বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা সৃষ্টির কারণ। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ হাজার ব্যক্তির বন্ধুত্বের বিনিময়ে হলেও এক ব্যক্তির শত্রুতা ক্রয় করবে না। সারকথা, কথা কাটাকাটির একমাত্র কারণ হচ্ছে নিজের জ্ঞান-গরিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব অধিক প্রকাশ করা। এতে অহংকার, ঘৃণা, মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি সবকিছু পাওয়া যায়। অতএব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের মধ্যে এসব বিষয় কিরূপে শামিল হবে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আপন ভাইয়ের কথা কেটে দিয়ো না, তার সাথে ঠাট্টা করো না এবং এমন ওয়াদা করো না যা পালন করবে না। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ তোমরা মানুষকে টাকা পয়সা দাও, কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে তাদের পাওয়া উচিত প্রসন্নতা ও সচ্চরিত্রতা। বলাবাহুল্য, কথা কাটাকাটি করা সচ্চরিত্রতার পরিপন্থী। পূর্ববর্তীগণ এ কাজটি করতে এত ভয় পেতেন যে, তাঁরা বন্ধুর কথা পুনরুক্তি করতেন না। তাঁদের নীতি ছিল, বন্ধুকে যদি বলা হয়, চল, আর সে জিজ্ঞেস করে, কোথায়? তবে তার সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে চল বলার সাথে সাথে চলা শুরু করতে হবে, জিজ্ঞেস করা যাবে না। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ আমার এক বন্ধু ইরাকে বসবাস করত। অভাব অনটনের সময় আমি তার কাছে গিয়ে বলতাম ঃ তোমার অর্থ-সম্পদ থেকে আমাকে কিছু দাও। সে একটি থলে আমার সামনে

রেখে দিত। আমি থলে থেকে প্রয়োজন মত টাকা পয়সা নিয়ে নিতাম। একদিন আমি তার কাছে গিয়ে বললাম ঃ আমার কিছু অর্থের দরকার। সে বলল ঃ কি পরিমাণ? এ কথা শুনতেই বন্ধুত্বের মিষ্টতা আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে গেল। অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ যখন তুমি তোমার বন্ধুর কাছে কিছু চাও এবং সে জিজ্ঞেস করে– কি করবে? তখন সে ভ্রাতৃত্বের হক বর্জন করে দেয়।

ভ্রাতৃত্বের চতুর্থ হক হচ্ছে, মুখে কথা বলা। কেননা, বন্ধুর সামনে মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকা যেমন ভ্রাতৃত্বের দাবী, তেমনি বন্ধুর পছন্দীয় কথাবার্তা তার সামনে বর্ণনা তার দাবী। বরং এ বিষয়টি ভ্রাতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। কিছু উপকার অর্জনের জন্যেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয়– অপকার থেকে বেঁচে থাকার জন্যে নয়। চুপ থাকার অর্থ মুখের দ্বারা অপরকে জ্বালাতন না করা। অতএব মানুষের উচিত বন্ধুর সাথে কথা বলা, আলাপ করা এবং প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করা। উদাহরণতঃ বন্ধু পেরেশানীর সম্মুখীন হলে অথবা কোন সংকটে পড়লে তার সাথে সমবেদনা প্রকাশ করবে এবং মুখে বলবে, আমিও তোমার দুঃখে দুঃখিত। যেসব পরিস্থিতিতে বন্ধু সুখী ও আনন্দিত হয়, সেগুলোতেও শরীক হওয়ার কথা মুখে ব্যক্ত করবে। কেননা, সুখে দুঃখে অংশীদার হওয়াই বন্ধুত্বের অর্থ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ اذا احب احدكم اخاه فليخبره (তোমাদের কেউ তার ভাইকে মহব্বত করলে তাকে মহব্বত সম্পর্কে অবহিত করে দেবে)। কেননা, অবহিত করলে মহব্বত বৃদ্ধি পায়। উদাহরণতঃ যদি কারও প্রতি তোমার মহব্বত হয়ে যায় এবং সে তা না জানে, তবে মহব্বতের উন্নতি হবে না। পক্ষান্তরে সে জানতে পারলে তোমার প্রতিও তার মনে মহব্বত সৃষ্টি হবে। তুমি যখন জানবে, তোমার প্রতি তারও মহব্বত রয়েছে, তখন তার প্রতি তোমার মহব্বত অবশ্যই বেড়ে যাবে। এমনিভাবে উভয়পক্ষ থেকে পলে পলে মহব্বত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। শরীয়তে ঈমানদারদের পারস্পরিক মহব্বত কাম্য ও পছন্দনীয়। এ কারণেই শরীয়ত প্রবর্তক রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মহব্বতের উপায় শিক্ষা দিয়ে বলেছেন ঃ

تهادوا وتحابوا অর্থাৎ, একে অপরকে উপঢৌকন দাও এবং মহব্বত কর।

মুখে বলার আরেক হক হল, বন্ধুর মনপূত নামে তাকে ডাকা। সামনে ও পেছনে তার সেই পছন্দসই নামটি উচ্চারণ করতে হবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যদি বন্ধুর সাথে ব্যবহারে তিনটি বিষয় মেনে চল, তবে তোমাদের সাথে তার বন্ধুত্ব-অকৃত্রিম হয়ে যাবে। এক, সাক্ষাৎ করার সময় প্রথমে বন্ধুকে সালাম কর। দুই, যত্ন সহকারে তাকে বসাও। তিন, যে নাম তার পছন্দসই, সে নামে তাকে ডাক। আরেকটি হক হচ্ছে, যার সামনে বন্ধু নিজের তারীফ পছন্দ করে, তার সামনে যেসব গুণ তুমি জান, সেগুলো বর্ণনা কর। এটা মহব্বতে আকৃষ্ট করার একটি বড় উপায়। সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের তারীফ করাও তেমনি, কিন্তু এই তারীফ মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত না হওয়া উচিত। এর চেয়ে জরুরী বিষয়, যদি অন্য ব্যক্তি বন্ধুর প্রশংসা করে তবে সানন্দে বন্ধুর কাছে এই প্রশংসা বর্ণনা করবে। এটা গোপন করা নিছক হিংসা ছাড়া কিছুই হবে না। আর একটি হক, বন্ধু যদি তোমার সাথে কোন উত্তম ব্যবহার করে, তবে তুমি তার শোকর আদায় করবে। এমন কি, যদি সদ্ব্যবহারের ইচ্ছা করে এবং তা পূর্ণ না হয়, তবুও শোকর আদায় করবে। যে বিষয়টি মহব্বত আকর্ষণে সর্বাধিক কার্যকর তা হচ্ছে, বন্ধুর পেছনে কেউ তাকে মন্দ বললে কিংবা তার মানহানির চেষ্টা করলে তুমি তার পক্ষ সমর্থনে তৎপর হয়ে যাবে এবং বক্তাকে চুপ করিয়ে দেবে। এ পরিস্থিতিতে চুপ থাকা হিংসা ও আন্তরিক ঘৃণার কারণ এবং বন্ধুত্বের হক আদায়ে ত্রুটির পরিচায়ক হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'বন্ধুকে দু'হাতের সাথে তুলনা করেছেন। এর কারণ এটাই যে, এক বন্ধু অপর বন্ধুর সাহায্য করবে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– المسلم اخو المسلم لايظلمه ولايخذله অর্থাৎ, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে না। বন্ধুর নিন্দা শুনা সাক্ষাৎ তাকে লাঞ্ছিত করা এবং শত্রুর হাতে সমর্পণ করার শামিল। কেননা, বন্ধুর ইযযত ক্ষত-বিক্ষত হতে দেয়া তার দেহের মাংস খন্ড-বিখন্ড হতে দেয়ার নামান্তর। একে এরূপ মনে কর, যেমন, কুকুর তোমাকে ছিঁড়ে ফেলছে এবং তোমার মাংসখন্ড ছিটকে দিচ্ছে, কিন্তু তোমার ভাই চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে এবং তোমার প্রতি অনুকম্পা করছে না। এ দৃশ্য তোমার কাছে কেমন খারাপ মনে হবে। অথচ ইযযত ভূলুণ্ঠিত হওয়া মাংস খন্ড-বিখন্ড হওয়ার চেয়েও অধিক

অপ্রিয় হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা গীবতকে মৃতের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ অর্থাৎ, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা একে অপছন্দ কর। আত্মা স্বপ্নে লওহে মাহফুয প্রত্যক্ষ করে। ফেরেশতারা এই প্রত্যক্ষ করা বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকারে প্রদর্শন করে। তারা গীবতকে মৃতের মাংস খাওয়ার আকারে পেশ করে থাকে। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে, সে মৃতের মাংস খাচ্ছে, তবে এর ব্যাখ্যা হবে, সে মানুষের গীবত করে। কেননা, কোন বিষয়কে আকৃতি দান করার সময় ফেরেশতারা সেই বিষয়ের মর্মগত মিলের প্রতিও লক্ষ্য রাখে। এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল ভ্রাতৃত্বের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা, শত্রুর নিন্দাবাদের সময় বন্ধুর পক্ষ সমর্থন করা এবং নিন্দুকের নিন্দা থেকে তাকে মুক্তি দেয়া ওয়াজিব।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ বন্ধুর গীবতের সময় তুমি তাকে এমনভাবে উল্লেখ করবে, যেমন তুমি চাও যে, তোমার গীবতের সময় কেউ তোমাকে উল্লেখ করুক। এমতাবস্থায় দুটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা তোমার জন্যে উপকারী। প্রথম, মনে কর, যে কথা তোমার বন্ধুর ব্যাপারে কেউ বলল, তা যদি তোমার ব্যাপারে বলা হত এবং তোমার বন্ধু সেখানে উপস্থিত থাকত, তবে তোমার বন্ধুর কাছে তুমি কি আশা করতে? তখন বন্ধুর যে বক্তব্য তোমার পছন্দ হত, তাই তার ব্যাপারে বিদ্রূপকারীদের সাথে তোমার বলা উচিত। দ্বিতীয়, মনে কর, তোমার বন্ধু দেয়ালের পেছনে দন্ডায়মান এবং তোমার বক্তব্য শুনছে। তার ধারণা, তুমি তার উপস্থিতি জান না। তখন তার পক্ষ সমর্থনে তুমি যা বলবে, তাই তার অবর্তমানেও বলা উচিত। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমার কোন ভাইয়ের আলোচনা তার অনুপস্থিতিতে হলে আমি মনে করে নেই, সে এখানে উপবিষ্ট রয়েছে। ফলে আমি এমন কথা বলি, যা সে উপস্থিত থাকলে পছন্দ করত। অপর এক বুযুর্গ বলেন ঃ যখন আমার বন্ধুর আলোচনা হয়, তখন আমি নিজেকে তার আকৃতিতে মনে করে নেই এবং তার সম্পর্কে এমন কথা বলি, যা আমার সম্পর্কে কেউ বললে পছন্দ করি। মানুষ নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, নিজের ভাইয়ের জন্যেও তাই পছন্দ করা খাঁটি মুসলমানী। হযরত আবু দারদা (রাঃ) এক জোয়ালে

দু'টি বলদকে জোতা অবস্থায় দেখলেন, সে দুটো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। ইতিমধ্যে একটি বলদ দাঁড়িয়ে শরীর চুলকাতে লাগল। দ্বিতীয় বলদটিও সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি এই দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর জন্যে যারা বন্ধুত্ব করে, তাদের অবস্থাও এমনিই। তারা উভয়েই আল্লাহর জন্যে কাজে নিয়োজিত থাকে। একজন দাঁড়ালে অন্যজনও তার অনুরূপ দাঁড়িয়ে যায়। একে অপরের অনুরূপ হওয়ার মাধ্যমেই এখলাস পূর্ণতা লাভ করে। যার মহব্বতে এখলাস নেই সে মোনাফেক। এখলাস হচ্ছে সম্মুখে-পিছনে, মুখে-অন্তরে, ভিতরে-বাইরে এবং একাকিত্বে ও জনসমক্ষে এক রকম হওয়া। এসব ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়াই বন্ধুত্বের ত্রুটি এবং ঈমানদারদের পথের বাধা। যে ব্যক্তি নিজেকে সর্বাবস্থায় এক রকম রাখতে সক্ষম নয়, তার উচিত বন্ধুত্বের নাম মুখে না নেয়া এবং নির্জনবাস অবলম্বন করা। কেননা, বন্ধুত্বের হক আদায় করা কঠিন। তওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তিই বন্ধুত্বের বিরাট সওয়াব হাসিল করার যোগ্য। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার প্রতিবেশী, তার হক উত্তমরূপে আদায় কর; তুমি মুসলমান হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তোমার সংসর্গে আছে, তার হক উত্তমরূপে আদায় কর; তুমি ঈমানদার হয়ে যাবে।

বন্ধুত্বের মৌখিক হকসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান। কেননা, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অর্থ-সম্পদের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম নয়। অর্থসম্পদে বন্ধুকে শরীক করা যখন বন্ধুত্বের হক সাব্যস্ত হয়েছে, তখন শিক্ষায় অংশীদার করা আরও উত্তমরূপে বন্ধুত্বের হক। অর্থাৎ, তুমি যদি শিক্ষায় পারদর্শী হও, তবে যেসব শিক্ষা বন্ধুর জন্যে পরকাল ও ইহকালে উপকারী, সেগুলো তাকে শেখাও। তোমার শিক্ষাদানের পর যদি সে তদনুযায়ী আমল না করে, তবে তাকে উপদেশ দেয়া তোমার কর্তব্য। অর্থাৎ, মন্দ কর্মের অনিষ্ট এবং তা বর্জন করার উপকারিতা তার সামনে বর্ণনা কর, যাতে সে কুকর্ম থেকে বিরত থাকে, কিন্তু এসব উপদেশ নির্জনে দেবে, যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে। কেননা, জনসমক্ষে উপদেশ দেয়া, লজ্জা দেয়া ও অপমান করার নামান্তর। পক্ষান্তরে একাকিত্বে উপদেশ দেয়া স্নেহ ও হিতাকাঙ্ক্ষার মধ্যে গণ্য। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

المؤمن مرأة المؤمن। অর্থাৎ, ঈমানদার একজন ঈমানদারের

আয়না। উদ্দেশ্য, সে তার দ্বারা এমন বিষয় জেনে নিতে পারে, যা নিজে নিজে জানতে পারে না। একজন মুমিন তার মুমিন ভাইয়ের মাধ্যমে নিজের দোষ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে, যেমন আয়না দ্বারা মানুষের বাহ্যিক দোষসমূহ জেনে নিতে পারে। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ যে তার ভাইকে গোপনে বুঝায়, সে তাকে উপদেশ দেয় এবং সৌন্দর্যমন্ডিত করে। আর যে শাসন করে, সে অপমান করে এবং দোষ দেয়। মুসইরকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ যে ব্যক্তি আপনাকে আপনার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করে, তাকে আপনি ভালবাসেন কি না? তিনি বললেন ঃ যদি সে আমাকে একান্তে নিয়ে নসীহত করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে ভালবাসি। পক্ষান্তরে জনসমক্ষে নসীহত করলে আমি তাকে ভালবাসি না। তিনি ঠিকই বলেছেন। কেননা, জনসমক্ষে নসীহত করা অপমান বৈ কিছুই নয়। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়জনকে শাসন করবেন; কিন্তু জনসমক্ষে নয়; বরং তাদেরকে নিজের আশ্রয়ে রেখে আলাদাভাবে তাদের গোনাহ সম্পর্কে গোপনে অবহিত করবেন। তাদের মোহরবন্ধ আমলনামা সেই ফেরেশতাদের হাতে দেয়া হবে, যারা তাদের সাথে জান্নাত পর্যন্ত যাবে। জান্নাতের দরজায় পৌঁছার পর ফেরেশতারা মোহরবন্ধ আমলনামা তাদের হাতে সমর্পণ করবে, যেন তারা তা পাঠ করে নেয়। অপরপক্ষে যারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র, তাদেরকে জনসমক্ষে ডাকা হবে এবং তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের গোনাহের সাক্ষ্য দেবে। এতে তাদের অপমান লাঞ্ছনা চরমে পৌঁছবে। আল্লাহ তা'আলা সেদিনের অবমাননা থেকে আমাদের সকলকে আপন আশ্রয়ে রাখুন! যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার সংসর্গ একাত্মতার মাধ্যমে অবলম্বন কর, মানুষের সংসর্গ উপদেশের মাধ্যমে, প্রবৃত্তির সংসর্গ বিরোধিতার মাধ্যমে এবং শয়তানের সংসর্গ শত্রুতার মাধ্যমে অবলম্বন কর।

প্রশ্ন হয়, উপদেশের মধ্যে তো দোষ উল্লেখ করতে হবে। এতে অন্তরে ঘৃণা উৎপন্ন হবে। এমতাবস্থায় উপদেশ ভ্রাতৃত্বের হক কিরূপে হবে? জওয়াব, সে দোষ উল্লেখ করলে অন্তরে ঘৃণা উৎপন্ন হয়, যে দোষের উপস্থিতি বন্ধু নিজে নিজেই জানে, কিন্তু যে দোষ আছে বলে সে নিজে অবগত নয়, সে সম্পর্কে অবগত করা সাক্ষাৎ স্নেহ ও অনুগ্রহ। বন্ধু বুদ্ধিমান হলে এতে তার অন্তর উপদেশদাতার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট

হবে। নির্বোধদের সম্পর্কে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। কেননা, তোমার কোন নিন্দনীয় কাজ অথবা মন্দ অভ্যাস সম্পর্কে কেউ তোমাকে অবহিত করলে এটা এমন হবে, যেমন তোমার কাপড়ের মধ্যে কোন বিচ্ছু অথবা সর্প লুকিয়ে আছে এবং তোমার সর্বনাশ করতে উদ্যত রয়েছে। এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি তোমাকে এই সর্প সম্পর্কে অবহিত করল। এখন তুমি যদি এই ব্যক্তির উপদেশ খারাপ মনে কর, তবে তোমার চেয়ে অধিক নির্বোধ কে হবে? বলাবাহুল্য, মন্দ অভ্যাসসমূহও বিচ্ছু এবং সর্পের মতই মানুষের পরকাল ধ্বংস করে দেয়। কেননা এগুলো মানুষের অন্তরাত্মাকে দংশন করে। এগুলোর বিষ দুনিয়ার সর্প-বিচ্ছুর বিষের চেয়ে অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক। হযরত ওমর (রাঃ) দোষ সম্পর্কে অবহিত করাকে হাদিয়া আখ্যা দিতেন এবং বলতেন, আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে তার ভাইয়ের কাছে তার দোষের হাদিয়া নিয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) একবার হযরত সালমান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার মতে আমার যে দোষ আপনি শুনেছেন, তা বর্ণনা করুন। সালমান বললেন ঃ এ বিষয়ে আমাকে মাফ করুন, কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি, আপনার কাছে দু'টি পোশাক আছে। একটি দিনে পরিধান করেন অপরটি রাতের বেলায়। আমি আরও শুনেছি, আপনি দস্তরখানে দু'প্রকার ব্যঞ্জন একত্রিত করেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ এগুলোর জন্যে চিন্তা করবেন না। এ দুটি ছাড়া আরও কিছু শুনেছেন কি? বললেন ঃ না। হুযায়ফা মারআশী একবার ইউসুফ ইবনে সাবাকে লেখেন ঃ আমি শুনেছি তুমি তোমার ধর্ম দুপয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছ। জনৈক দুধওয়ালা বন্ধুকে তুমি দুধের দাম জিজ্ঞেস করলে সে ছয় পয়সা চাইল, তুমি চার পয়সা বললে সে দিয়ে দিল। অতএব তুমি তোমার মাথার উপর থেকে গাফেলদের পাল্লা নামিয়ে দাও এবং অনবধানতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হও। জেনে রাখ, যে কোরআন পাঠ করে এবং এতে ধনী না হয়ে দুনিয়াদার হয়ে যায়, আমার আশংকা, না জানি সে আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে ঠাট্টাকারী হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা মিথ্যুকদের এই বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছেন যে, তারা উপদেশদাতাকে শত্রু মনে করে। এরশাদ হয়েছে—

وَلٰكِنْ لَّا يُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ অর্থাৎ, কিন্তু তারা নসীহতকারীদেরকে ভালবাসেন না।

কিন্তু তুমি যদি জান, তোমার বন্ধু নিজের দোষ সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও তা ত্যাগ করতে পারছে না, তবে লক্ষ্য করবে সে তা গোপন করে কিনা। যদি গোপন করে, তবে তুমি তা ফাঁস করবে না। আর যদি দোষটি প্রকাশ্যে করে, তবে নম্রতা সহকারে উপদেশ দেবে। যাতে সে তোমার কাছ থেকে পলায়ন না করে। যদি জানা যায়, উপদেশ তার মধ্যে ক্রিয়া করবে না এবং সে নিজের মন থেকে বাধ্য, তবে উপদেশ না দিয়ে চুপ থাকাই উত্তম। এসব কথা সেসব বিষয়ে, যেগুলো বন্ধুর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তোমার হকে ক্রুটি করার সাথে সম্পর্ক রাখে। এগুলোতে সহনশীল হওয়া এবং মার্জনা করা ওয়াজিব। অবশ্য বিষয়গুলো যদি এমন হয় যে, মেলামেশা বর্জনে উদ্বুদ্ধ করে, তবে নিরালায় শাসন করা বন্ধুত্ব বর্জন করার চেয়ে উত্তম। শাসনও ইশারা-ইঙ্গিতে করা পরিষ্কার ভাষায় করার চেয়ে ভাল এবং কাগজে লেখে দেয়া মৌখিক বলা অপেক্ষা উত্তম। সহ্য করা সর্বাধিক উত্তম। কেননা, তোমার বন্ধুত্বের উদ্দেশ্য তার সম্মান করা ও হক আদায় করা হওয়া উচিত। এরূপ নিয়ত করা উচিত নয় যে, তাকে তুমি তোমার কাজে লাগাবে এবং সে তোমার সাথে নম্রতা করবে। আবু বকর কাত্তানী বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আমার সংসর্গে থাকতে লাগল, যা আমার মনের উপর কঠিন ছিল। আমি একদিন তাকে একটি বস্তু দিয়ে দিলাম, যাতে আমার মনের বিরুদ্ধ ভাব দূর হয়ে যায়; কিন্তু তা দূর হল না। এর পর আমি তার হাতে ধরলাম এবং কক্ষের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললাম ঃ তোমার পা আমার গালে রাখ। সে অস্বীকার করলে আমি বললাম ঃ অবশ্যই রাখতে হবে। অতঃপর সে তার পা আমার গালে রাখল। এতে আমার মন থেকে বিরুদ্ধ ভাবটি চলে গেল। আবু আলী রাবতী বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ রাযীর সংসর্গ অবলম্বন করতে চাইলাম। তিনি জঙ্গলে গমন করতেন। আমার বাসনা শুনে তিনি বললেন ঃ শাসক আপনিই হবেন। তিনি বললেন ঃ তা হলে আমার প্রত্যেকটি কথা তোমাকে মানতে হবে। আমি বললাম ঃ শিরোধার্য। এর পর তিনি একটি থলিয়ায় সফরের আসবাবপত্র রাখলেন এবং নিজের পিঠে তুলে নিলেন। আমি যখনই তাকে বলতাম, বোঝাটি আমাকে দিন, তিনি বলতেন ঃ আমি শাসক নই কিনা? আমার কথা মান্য করা তোমার কর্তব্য। এক রাতে বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। তাঁর কাছে ছিল একটি চাদর। তিনি আমাকে বসিয়ে দিয়ে

সকাল পর্যন্ত আমার উপর চাদর টেনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তখন মনে মনে বলছিলাম ঃ হায়, আমি যদি তাঁকে শাসক মেনে না নিতাম।

বন্ধুত্বের পঞ্চম হক হচ্ছে, বন্ধুর ভুল-ক্রুটি ও অপরাধ মার্জনা করা। বন্ধুর ভুল-ক্রুটি দু'প্রকার হতে পারে। (এক), কোন গোনাহ করার মাধ্যমে ধর্ম কর্মে ক্রুটি করবে, না হয় (দুই), বিশেষভাবে তোমার হকে ক্রুটি করবে। গোনাহ্ করা অথবা গোনাহের উপর কায়েম থাকার কারণে যে ক্রুটি হয় তার জন্যে তোমার উচিত তাকে নম্রভাবে নসীহত করা, যাতে তার বক্রতা দূর হয়ে যায় এবং সে পরহেযগারীর দিকে ফিরে আসে। যদি তুমি নম্রভাবে নসীহত করতে না পার এবং সে গোনাহের উপরই কায়েম থাকে, তবে এরূপ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব বহাল রাখা অথবা সম্পর্কচ্ছেদ করার ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অভিমত বিভিন্ন রূপ। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ যখন কারও বন্ধু নিজের অবস্থা পাল্টে দেয়, তখন ভাল অবস্থার কারণে যেমন তাকে মহব্বত করেছিল, তেমনি মন্দ অবস্থার কারণে তাকে পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁর মতে এটাই হচ্ছে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত ও শত্রুতার দাবী। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন সাহাবী বলেন ঃ যখন তোমার বন্ধুর অবস্থা বদলে যায় এবং পূর্বের অবস্থা না থাকে, তখন এ কারণে তাকে পরিত্যাগ করো না। কেননা, মানুষ কখনও সৎ থাকে এবং কখনও অন্যায় করে ফেলে। সর্বদা এক অবস্থার উপর অটল থাকে না। হযরত নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ তোমার বন্ধু কোন গোনাহ করলে এই গোনাহের কারণে তার সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করো না। কেননা, সে আজ গোনাহ করবে– কাল ছেড়ে দেবে। তিনি আরও বলেন ঃ মানুষের সাথে আলেমের ক্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করো না। কেননা, আলেম ক্রুটি-বিচ্যুতি করে; কিন্তু পরে তা ছেড়ে দেয়। এক হাদীসে আছে– আলেমের ক্রুটি-বিচ্যুতিকে ভয় কর এবং তার সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করো না। আশা কর, সে তার কর্মকান্ড পরিত্যাগ করবে। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন। সে মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিল। একবার এক ব্যক্তি সিরিয়া থেকে মদীনায় আগমন করলে তিনি তাকে শুধালেন ঃ আমার অমুক ভাই কেমন আছে? লোকটি আরজ করল ঃ সে আপনার ভাই হবে কেন? সে তো শয়তানের ভাই। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকটি বলল ঃ সে অনেক কবীরা গোনাহ করেছে এবং অবশেষে মদ্যপান শুরু করেছে। হযরত ওমর

(রাঃ) বললেন ঃ তুমি যখন সিরিয়ায় ফিরে যাও, তখন আমাকে খবর দিয়ো। লোকটি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলে হযরত ওমর (রাঃ) একটি চিঠিতে লেখলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ـ

অর্থাৎ, এই কিতাব পরাক্রমশালী জ্ঞানময় আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। এর পর তিরস্কার ও ভর্ৎসনার কথা লেখলেন। লোকটি পত্র পাঠ করে বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা ঠিক বলেছেন এবং ওমর আমাকে নসীহত করেছেন। এর পর সে তওবা করে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। কথিত আছে, এক ব্যক্তি কারও প্রতি আসক্ত হওয়ার পর তার আল্লাহর ওয়াস্তের বন্ধুকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে বলল ঃ আমি অপরাধ করেছি। এখন তুমি যদি আমার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখতে চাও, তবে রেখো না। সে জওয়াব দিল ঃ আমি এরূপ নই যে, তোমার ত্রুটির কারণে বন্ধুত্ব খতম করে দেব। এর পর সে আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিজ্ঞা করল, যে পর্যন্ত বন্ধুকে কাম প্রবৃত্তি থেকে উদ্ধার করা না হয়, সে পানাহার কিছুই করবে না। অতঃপর সে অনশন শুরু করল। সে প্রত্যেক দিন তার বন্ধুকে অবস্থা জিজ্ঞেস করত। বন্ধু বলত ঃ অন্তর পূর্বাবস্থায়ই অটল রয়েছে। সে দুঃখে ও ক্ষুধায় দিন দিন কাতর হতে লাগল। অবশেষে বিনা পানাহারে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এর পর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমার অন্তর থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কামাসক্তি সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে।

অনুরূপ আর একটি প্রচলিত গল্প হচ্ছে, পূর্ববর্তীগণের মধ্যে দু'বন্ধু ছিল। তাদের একজন সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল। জনৈক ব্যক্তি অপর বন্ধুকে বলল ঃ আপনি তার সাথে দেখাসাক্ষাৎ ত্যাগ করেন না কেন? সে তো পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। বন্ধু বলল ঃ এ সময়েই তো তার কাছে থাকা আমার জন্যে অধিক জরুরী। এ দুঃসময়ে তাকে বর্জন করব কিরূপে? এখন তার হাত ধরে নম্র ভাষায় তাকে বুঝাব এবং পূর্বেকার

অবস্থায় ফিরে আসতে বলব। কবি সত্যই বলেছেন—

دوست ان دانم که گیرد دست درست
درپریشان حالی ودرماندگی ـ

সংকট মুহূর্তে যে বন্ধুর হাত ধরে; আমি তাকেই সত্যিকার বন্ধু মনে করি।

বনী ইসরাঈলের গল্পে বর্ণিত আছে, দু'বন্ধু এক পাহাড়ে বসে এবাদত করত। তাদের একজন গোশত কেনার জন্যে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এল। সে কসাইয়ের দোকানে এক বেশ্যাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল এবং নির্জনে তার সাথে কুকর্ম করল। তিন দিন পর্যন্ত সে বেশ্যার কাছেই পড়ে রইল এবং লজ্জার কারণে বন্ধুর কাছে ফিরে গেল না। বন্ধু তিন দিন তাকে না দেখে শহরে চলে এল এবং মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করে করে বেশ্যার বাড়ীতে তার সন্ধান পেল। দেখামাত্রই সে তার গলা জড়িয়ে ধরল এবং চুম্বনের পর চুম্বন করতে লাগল। প্রথমোক্ত বন্ধু নিজের অপরাধের কারণে অত্যন্ত লজ্জিত ছিল বিধায় বলতে লাগল ঃ তুমি কে? আমি তোমাকে চিনি না। সে বলল ঃ বন্ধু, তোমার অবস্থা আমি জেনে ফেলেছি। এ সময়ে তুমি আমার যতটুকু প্রিয়, ততটুকু পূর্বে কখনও ছিলে না। বন্ধু যখন দেখল, অপরাধ করা সত্ত্বেও সে তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে না, তখন তার সাথে চলে এল এবং পূর্বে যেমন ছিল, তেমনি হয়ে গেল। অপরাধী বন্ধুর ব্যাপারে পূর্ববর্তীগণের এটাই ছিল নীতি। এ নীতি হযরত আবু যর (রাঃ)-এর নীতি অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ। তবে তাঁর নীতিও নিঃসন্দেহে ভাল এবং নিরাপদ। প্রশ্ন হতে পারে, গোনাহগারের সাথে তো শুরুতেই বন্ধুত্ব করা জায়েয নয়। অতএব বন্ধু গোনাহ করলে তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া ওয়াজিব হওয়া উচিত। এমতাবস্থায় পূর্ববর্তীগণের নীতি অধিক সূক্ষ্ম এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ হবে কিরূপে? জওয়াব হচ্ছে, এ নীতির মধ্যে নম্রতা, অন্তরকে আকৃষ্ট করা এবং অনুকম্পা বিদ্যমান রয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গোনাহ থেকে ফিরে এসে তওবা করতে পারে। কেননা, সংসর্গ ও মেলামেশা অব্যাহত থাকার কারণে লজ্জা ও অনুতাপ উত্তরোত্তর স্থায়িত্ব লাভ করবে। পক্ষান্তরে অপরাধী সংসর্গ আশা করতে না পারলে গোনাহের উপর স্থির থেকে যাবে। বিচক্ষণতার সাথে এ নীতিটি অধিক

সামঞ্জস্যশীল হওয়ার কারণ, বন্ধুত্ব আত্মীয়তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে গেলে তার হক দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তা বজায় রাখা ওয়াজিব হয়। বন্ধুত্ব বজায় রাখা এবং তা মেনে চলার এক পন্থা হচ্ছে প্রয়োজনের মুহূর্তে বন্ধুকে ত্যাগ না করা। ধর্মীয় প্রয়োজন অন্য সকল প্রয়োজনের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। গোনাহ করার কারণে বন্ধু যে বিপদে পতিত হয়, তার কারণে ধর্মীয় প্রয়োজন প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এমতাবস্থায় তার রেয়াত করা, তাকে পরিত্যাগ না করা এবং তার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা একান্ত জরুরী, যাতে এই ব্যবহার তাকে বিপদমুক্তিতে সহায়তা করে। বস্তুতঃ বিপদাপদের জন্যেই বন্ধুত্ব হয়। ধর্ম নষ্ট হওয়ার মত বড় বিপদ আর কি হতে পারে? গোনাহ্গার ব্যক্তি যখন কোন পরহেযগারের সংসর্গে থাকে এবং তার খোদাভীতি ও ওজিফা প্রত্যক্ষ করে, তখন কিছু দিনের মধ্যে সেও গোনাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গোনাহের উপর স্থির থাকতে লজ্জাবোধ করে। যেমন, কোন অলস ব্যক্তি কোন কর্মপটুর সাথে থাকলে সে অলস থাকতে পারে না। কর্মপটু হয়ে যায়। জাফর ইবনে সোলায়মান বলেন ঃ যখন আমার আমলে শৈথিল্য দেখা দেয় তখন মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'কে দেখি এবং এবাদতে তাঁর একাগ্রতার কথা কল্পনা করি। এতে আমার এবাদতের আনন্দ পূর্ববৎ হয়ে যায়। অলসতা দূর হয়ে যায় এবং আমি এক সপ্তাহ পর্যন্ত খুব কর্মচঞ্চল থাকি। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত বক্তব্য, বন্ধুত্ব বংশগত ক্রমধারার অনুরূপ। গোনাহের কারণে বংশের কাউকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাঃ)-কে তাঁর নিকট আত্মীয়দের সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٌٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ অর্থাৎ, যদি তারা আপনার নাফরমানী করে, তবে বলে দিন ঃ আমি তোমাদের কর্ম থেকে মুক্ত।

এখানে আমি তোমাদের থেকে মুক্ত একথা বলা হয়নি। বলাবাহুল্য, আত্মীয়তা ও বংশগত অধিকারের খাতিরেই এরূপ বলা হয়নি। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁকে বলা হল ঃ আপনার অমুক ভাই এমন সব গোনাহে জড়িয়ে পড়েছে, আপনি তাকে পরিত্যাগ করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমি তার কর্মকাণ্ড খারাপ মনে করি, কিন্তু সে আমার ভাই, তাকে পরিত্যাগ করতে পারি না। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব

আত্মীয়তার ভ্রাতৃত্বের তুলনায় অধিক দৃঢ় হয়ে থাকে। জনৈক দার্শনিককে প্রশ্ন করা হল ঃ ভাই ও বন্ধুর মধ্যে আপনার কাছে কে অধিক প্রিয়? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি ভাইকেও তখন মহব্বত করি, যখন সে আমার বন্ধু হয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ তোমার অনেক ভাই তোমার মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেনি। এ কারণেই বলা হয়েছে, আত্মীয়তা বন্ধুত্বের মুখাপেক্ষী, কিন্তু বন্ধুত্ব আত্মীয়তার মুখাপেক্ষী নয়। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) বলেন ঃ এক দিনের বন্ধুত্ব সৌজন্য, এক মাসের বন্ধুত্ব আত্মীয়তা এবং এক বছরের বন্ধুত্ব নিকট আত্মীয়তা। যে কেউ এটা ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ছিন্ন করবেন। মোট কথা, বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে যাওয়ার পর তা বজায় রাখা ওয়াজিব। তবে প্রথমেই গোনাহগারের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, পূর্ব থেকে তার কোন হক থাকে না। পূর্ব থেকে যদি তার আত্মীয়তার হক থাকে, তবে তার সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করা উচিত নয়; বরং ভাল ব্যবহার করা উচিত। এর প্রমাণ, প্রথমেই বন্ধুত্ব না করা নিন্দনীয়ও নয়, অপছন্দনীয়ও নয়; বরং বলা হয়, একাকিত্বই উত্তম, কিন্তু ভ্রাতৃত্ব চিরতরে ছিন্ন করতে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে খারাপ। এটা তালাক ও বিবাহের মতই। বিবাহ না করার চেয়ে তালাক দেয়া আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক দূষণীয়। রসূলে করীম (সাঃ) ভ্রাতৃত্ব ছিন্ন করার ব্যাপারে এরশাদ করেন ঃ

شرار عباد الله المشاءون بالنميمة والمفرقون بين الاحبة ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার দুষ্ট বান্দা তারাই যারা পরনিন্দা করে বেড়ায় এবং বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে।

জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন ঃ শয়তান চায় তোমার বন্ধু এমন কোন কাজ করুক, যদ্দরুন তুমি তাকে পরিত্যাগ কর এবং মেলামেশা বর্জন কর। এখন তুমি যদি তাই কর, তবে শয়তানের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে এবং তার উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। অর্থাৎ, মানুষকে গোনাহে জড়িত করা যেমন শয়তানের কাম্য, তেমনি বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াও তার পছন্দনীয়। সুতরাং কোন বন্ধু যখন ভুল করে এবং শয়তানের এক উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়, তখন বন্ধুর সাথে দেখাশোনা বর্জন করে শয়তানের দ্বিতীয়

উদ্দেশ্য পূর্ণ করার আবশ্যকতা আছে কি? এক ব্যক্তি গোনাহ করার পর অপর ব্যক্তি যখন তাকে গালিগালাজ করল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ধমকে দিলেন এবং বললেন ঃ আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ, এক উদ্দেশ্য তো তার সিদ্ধ হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টি তুমি সিদ্ধ করো না।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বন্ধুত্ব অব্যাহত রাখা এবং প্রথমে বন্ধুত্ব না করার মধ্যে পার্থক্য ফুটে উঠেছে। একে এভাবেও বলা যায়, গোনাহ্‌গারদের সাথে মেলামেশা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি বন্ধুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাও নিষিদ্ধ। সুতরাং বিষয় দুটি পরস্পর বিরোধী, কিন্তু বন্ধুত্বের হক মানতে থাকা অপরটিকে জোরদার করে। তাই এটাই উত্তম।

এ পর্যন্ত বন্ধুর ধর্ম সম্পর্কিত ত্রুটিবিচ্যুতির অবস্থা বর্ণিত হল। যেসকল ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশেষভাবে বন্ধুর সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলো সকলের মতেই মার্জনা করা উত্তম; বরং যেসকল ত্রুটির কোন ভাল অজুহাত হতে পারে, সেগুলো সেই অর্থেই ধরে নেয়া ওয়াজিব। সেমতে বলা হয়, বন্ধুর জন্য তার বন্ধুর অপরাধের কোন ওযর বের করা উচিত। এর পরও মন না মানলে নিজেকেই ধিক্কার দেবে এবং বলবে ঃ তুই কেমন পাষাণ যে, তোর বন্ধু ওযরখাহী করে, আর তুই মানিস না? এতে বুঝা যায়, তুই-ই দোষী– বন্ধুর অপরাধ নয়। সুতরাং বন্ধুকে ভাল বলা সম্ভব না হলে কমপক্ষে তার প্রতি রাগ করবে না, কিন্তু তা হতে পারে না। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ যাকে ক্রুদ্ধ করা হয়; কিন্তু সে ক্রুদ্ধ হয় না, সে গাধা যাকে মানানো হয়, কিন্তু সে মানে না, সে শয়তান সুতরাং মানুষের জন্যে গাধা হওয়াও উচত নয় এবং শয়তান হওয়াও উচিত নয়। বরং নিজেই বন্ধুর স্থলবর্তী হয়ে নিজেকে মানাবে এবং না মেনে শয়তান হওয়া থেকে বিরত থাকবে।

বন্ধু সত্য মিথ্যা যে কোন ওযর পেশ করুক, তা মেনে নেয়া উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من اعتذر اليه اخوه فلم يقبل عذره فعليه مثل اثم صاحب المكس ـ

অর্থাৎ, যার সামনে তার ভাই ওযর পেশ করে এবং সে কবুল করে না, তার সে ব্যক্তির মত পাপ হবে, যে বলপূর্বক কর আদায় করে।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ

المؤمن سريع الغضب سريع الرضاء ـ

অর্থাৎ, মুমিন দ্রুত রাগ করে এবং দ্রুত রাযী হয়ে যায়।

এখানে মুমিন রাগ করে না বলা হয়নি। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ والكاظمين الغيظ অর্থাৎ, এবং যারা ক্রোধ দমন করে। এখানে "যারা ক্রোধ করে না" বলা হয়নি। এর কারণ, অভ্যাসের দিক দিয়ে এটা সম্ভবপর নয় যে, কাউকে আঘাত করা হবে, আর সে ব্যথা অনুভব করবে না। অবশ্য আঘাত সহ্য করা এবং রাগ হজম করে নেয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় রাগের বিপরীত আমল করা যায়। রাগ প্রতিশোধ নেয়ার দাবী করে। এখানে প্রতিশোধ বর্জন করা তো সম্ভব, কিন্তু রাগ অন্তর থেকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করা সম্ভব নয়।

আবু সোলায়মান দারানী আহমদ ইবনে আবিল হাওয়ারী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, এ যুগে তুমি কারও সাথে বন্ধুত্ব করলে বন্ধুর কোন মন্দ বিষয় জেনে তাকে শাসন করো না। যদি শাসন কর তবে জওয়াবে পূর্বের চেয়েও মন্দ বিষয় দেখার আশংকা রয়েছে। আহমদ বলেন ঃ আমি বিষয়টি পরীক্ষা করে সত্য পেয়েছি। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ বন্ধুর অপরাধে সবর করা তাকে শাসন করার চেয়ে ভাল। শাসন করা দেখা সাক্ষাৎ বর্জনের তুলনায় এবং দেখা সাক্ষাৎ বর্জন গীবত করার তুলনায় উত্তম। গীবত করার সময় শত্রুতায় বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ـ

অর্থাৎ, আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ও শত্রুদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেবেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ

احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ـ

অর্থাৎ, তোমার বন্ধুকে মাঝারি ধরনের মহব্বত কর। সে হয় তো কোনদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। তোমার শত্রুর সাথে মাঝারি ধরনের শত্রুতা রাখ। হয় তো সে কোন দিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।

বন্ধুত্বের ষষ্ঠ হক হল বন্ধুর জন্যে তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এমন দোয়া করা, যা নিজের জন্যে পছন্দ করা হয়। অনুরূপভাবে তার পরিবার ও আত্মীয়দের জন্যে দোয়া করা। নিজের জন্যে যেমন দোয়া করবে, বন্ধুর জন্যেও তেমনি দোয়া করবে। কেননা, বাস্তবে তার জন্যে দোয়া করার মানেই নিজের জন্যে দোয়া করা। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اذا دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب قال الملك لك مثل ذلك -

অর্থাৎ, যখন কেউ তার বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করে, তখন ফেরেশতা বলে ঃ তোমার জন্যেও অনুরূপ হবে। এক রেওয়ায়েতে ফেরেশতা বলে কথাটির স্থলে বলা হয়েছে– আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমি এ দোয়া প্রথমে তোমার জন্যে কবুল করব। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ বন্ধুর জন্যে দোয়া করলে এত কবুল হয়, যা নিজের জন্যে করলে হয় না। আর এক হাদীসে আছে– دعوة الرجل لاخيه فى الغيب لاترد অর্থাৎ, বন্ধুর অনুপস্থিতে তার জন্যে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। হযরত আবু দারদা বলেন ঃ আমি সেজদায় আমার সত্তর জন বন্ধুর জন্যে তাদের নাম নিয়ে নিয়ে দোয়া করি। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইস্পাহানী বলেন ঃ এমন সৎ বন্ধু পাওয়া কঠিন, যে তোমার মৃত্যুর পর পরিবারের লোকেরা যখন তোমার ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করে এবং তোমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি পেয়ে সুখে মত্ত থাকে, তখন সে একা তোমার জন্যে দুঃখ করে, তোমার অতীত আমল ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে শংকাবোধ করে এবং রাতের অন্ধকারে তোমার জন্যে দোয়া করে; অথচ তুমি মাটির স্তূপের নীচে পড়ে থাক। এ ব্যাপারে সে ফেরেশতাদের অনুসরণ করে। হাদীসে আছে– যখন কেউ মারা যায়, তখন লোকে বলে ঃ কি ছেড়ে গেছে? ফেরেশতারা বলে ঃ পরবর্তী জীবনের জন্যে কি পাঠিয়েছে? অতীত আমল ভাল হলে ফেরেশতারা খুশী হয়, তার অবস্থা জিজ্ঞেস করে এবং তার জন্যে সুপারিশ করে। কথিত

আছে, বন্ধুর মৃত্যুর খবর পেয়ে যে ব্যক্তি তার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করে, তাকে এমন লেখা হবে যেন সে জানাযায় উপস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কবরে মৃতের অবস্থা পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার মত হয়। যে পানিতে ডুবতে থাকে, সে সবকিছুরই আশ্রয় নিতে চায়। মৃত ব্যক্তিও নিজের পুত্র, পিতা, ভ্রাতা অথবা আত্মীয়দের দোয়ার প্রতীক্ষায় থাকে। মৃতদের কবরে জীবিতদের দোয়ায় পাহাড়সম নূর এসে যায়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মৃতদের জন্যে দোয়া জীবিতদের উপঢৌকনের মত। এক ফেরেশতা দোয়াকে একটি নূরের খাঞ্চায় রেখে নূরের রুমাল দ্বারা আবৃত করে মৃতের কাছে নিয়ে যায় এবং বলে ঃ এই উপঢৌকন তোমার অমুক বন্ধু অথবা অমুক আত্মীয় পাঠিয়েছে। মৃত ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয়, যেমন জীবিতরা উপঢৌকন পেয়ে আনন্দিত হয়।

বন্ধুত্বের সপ্তম হক 'ওফা' (বন্ধুত্ব রক্ষাকরণ) ও এখলাস। ওফার অর্থ হল, বন্ধুর জীবদ্দশা পর্যন্ত বন্ধুত্বের উপর দৃঢ় থাকা এবং তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহার অব্যাহত রাখা। কেননা, বন্ধুত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে আখেরাতে উপকার লাভ। যদি মৃত্যুর পূর্বেই বন্ধুত্ব খতম হয়ে যায়, তবে এত পরিশ্রম ও চেষ্টা অর্থহীন হয়ে যাবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আখেরাতে যে সাত ব্যক্তি আল্লাহ্র ছায়ায় স্থান পাবে, তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ তাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি তারা, যারা পরস্পর আল্লাহ্র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করেছে, তার উপরই স্থির রয়েছে এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মৃত্যুর পর অল্প ওফাও জীবদ্দশার অনেক ওফা অপেক্ষা উত্তম। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক বৃদ্ধার তাযীম করেছিলেন। তাঁকে বৃদ্ধার অবস্থা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এই বৃদ্ধা খাদীজার আমলে আমার কাছে আসত। মোট কথা, বন্ধুর সকল বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের সম্মান করা বন্ধুত্ব রক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাদের সম্মান প্রদর্শনের প্রভাব বন্ধুর মনে তার নিজের সম্মান করার তুলনায় বেশী হয়। স্নেহ ভালবাসার জোর তখনই জানা যায়, যখন তা বন্ধুকে অতিক্রম করে তার আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত পৌঁছায়। এমনকি, বন্ধুর দরজার কুকুরকে অন্যান্য কুকুরের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সর্বক্ষণ বন্ধুত্ব রক্ষা করা না হলে শয়তান সুযোগ পেয়ে যায়। কেননা, যারা আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব

করে, তাদের প্রতি শয়তানের যে হিংসা হয়, তা সেই দু'ব্যক্তির প্রতি হয় না, যারা কোন ভাল কাজে একে অপরের সহায়তা করে। শয়তান সর্বদা বন্ধুদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার চেষ্টায় থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ -

অর্থাৎ, আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন উত্তম কথাই বলে, শয়তান তাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে থাকে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَدْ اَحْسَنَ بِىْٓ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْ -

অর্থাৎ, তিনি আমার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন যখন আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন; শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার পর।

বলা হয়, যখন দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ তখনই হতে পারে যখন তাদের কেউ গোনাহ করে। বিশর (রঃ) বলতেন ঃ যখন বান্দা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ত্রুটি করে, তখন আল্লাহ তার কাছ থেকে তার বন্ধুকে ছিনিয়ে নেন। এ কারণেই হযরত ইবনে মোবারক বলেন ঃ বন্ধুদের সাথে বসা এবং মিতব্যয়িতার দিকে ফিরে আসাই সর্বাধিক সুস্বাদু বস্তু। যে মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে হয়, তাকেই চিরন্তন মহব্বত বলা হয়। আর যে মহব্বত কোন স্বার্থের ভিত্তিতে হয়, তা সে স্বার্থ দূর হয়ে গেলেই বিদূরিত হয়ে যায়। আল্লাহর জন্যে মহব্বতের এক ফল এই যে, এতে ধর্মীয় ও জাগতিক কোন ব্যাপারেই হিংসা হয় না। হিংসার কোন কারণও নেই। কেননা, এক বন্ধুর যে সম্পদ থাকে, তার উপকারিতা অপর বন্ধু পায়। আল্লাহ তাআলা এরূপ বন্ধুদেরকে এ গুণেই বিশেষিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ -

অর্থাৎ, তারা যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাতে নিজেদের অন্তরে কোন

স্বার্থপরতা অনুভব করে না এবং তারা নিজেদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, অন্তরে স্বার্থ থাকাই হিংসা।

মহব্বত রক্ষাকরণের এক উপায় হল, নিজে যত উচ্চ মর্যাদায়ই পৌছে থাক না কেন, বন্ধুর আতিথ্যে নিজের অবস্থা পরিবর্তন না করা। শান-শওকত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বন্ধুদের প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা নীচতা। জনৈক বুযুর্গ তাঁর পুত্রকে ওসিয়ত করে বললেন ঃ বৎস, যার মধ্যে নিম্নোক্ত গুণসমূহ থাকে, কেবল তার সংসর্গই অবলম্বন করবে– তার কাছে তোমার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সে তোমার কাছে আসবে। তুমি তার মুখাপেক্ষী না হলে সে তোমার কাছে কিছু আশা করবে না। তার মর্যাদা বেড়ে গেলে সে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করবে না।

মহব্বত রক্ষা করার আরেকটি উপায় হল, বন্ধুর বিরহ ও বিচ্ছেদকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে করা। ইবনে ওয়ায়নার সম্মুখে এ সম্পর্কিত একটি কবিতা পাঠ করা হলে তিনি বললেন ঃ আমি কিছু লোকের সঙ্গে একত্রে বসবাস করেছি। তাদের কাছ থেকে আলাদা হওয়ার পর ত্রিশ বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু কখনও কল্পনায় আসে না যে, তাদের বিরহ বেদনা মন থেকে মুছে গেছে। বন্ধুত্ব রক্ষা করার আর একটি উপায়, বন্ধুর বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ না শোনা। বিশেষতঃ এমন লোকদেরর কাছ থেকে না শোনা, যারা প্রথমে জাহির করে যে, তারা অমুকের বন্ধু, এর পর তার বিরুদ্ধেই বিদ্বেষসূচক কথাবার্তা বলে। পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টির এটা একটা সূক্ষ্ম উপায়। যে ব্যক্তি বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করে না এবং বন্ধুর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শ্রবণ করে, তার বন্ধুত্ব ক্ষণভঙ্গুর হয়ে থাকে। জনৈক ব্যক্তি একজন দার্শনিককে বলল ঃ আমি আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। দার্শনিক বললেন ঃ তিনটি বিষয় মেনে নিলে আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করব। এক, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনবে না, দুই– আমার কথার বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না এবং তিন– ছলনা ও অঙ্গভঙ্গি দিয়ে আমাকে দলিত করবে না। বন্ধুত্ব রক্ষা করার আর একটি উপায় হল, বন্ধুর শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তোমার বন্ধু তোমার শত্রুর অনুগত হয়ে যায়, তখন তোমার শত্রুতায় উভয়েই অংশীদার হয়।

বন্ধুত্বের অষ্টম হক বন্ধুকে কষ্ট না দেয়া। অর্থাৎ, তার উপর এমন কোন বোঝা চাপাবে না এবং তাকে এমন কোন ফরমায়েশ দেবে না,

যাতে তার কষ্ট হয়। কাজেই তার কাছে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদের সাহায্য এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইবে না। মনে করবে, বন্ধুর দোয়ায় বরকত হবে, তার সাক্ষাতে মন প্রফুল্ল হবে এবং ধর্মকর্মে সাহায্য পাওয়া যাবে। বন্ধুর কোন কাজ করে দিলে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যে তার বন্ধুর কাছে এমন বস্তু কামনা করে, যা বন্ধু তার কাছে কামনা করে না, সে বন্ধুর প্রতি জুলুম করে। যে তার বন্ধুর কাছ থেকে এমন বস্তু পেতে চায়, যা বন্ধু তার কাছ থেকে পেতে চায়, সে বন্ধুকে কষ্টে ফেলে দেয়। আর যে বন্ধুর কাছে কিছুই চায় না, সে বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করে। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার বন্ধুদের মধ্যে নিজেকে মর্যাদার চেয়ে বড় করে রাখবে, সে নিজেও গোনাহগার হবে এবং তার বন্ধুরাও গোনাহগার হবে। যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদা অনুযায়ীই বন্ধুদের মধ্যে থাকবে, সে নিজে কষ্ট করবে এবং বন্ধুদেরকেও কষ্ট দেবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদার চেয়ে কম হয়ে তাদের মধ্যে থাকবে, সে নিজে এবং বন্ধুরা সকলেই আরামে থাকবে। অধিকতর হালকা থাকার উপায় হল, লৌকিকতা দূরে সরিয়ে রাখা; এমনকি, যে কাজে নিজের কাছে লজ্জা করবে না, তাতে বন্ধুদের কাছেও লজ্জা করবে না। হযরত জুনায়েদ বলেন ঃ আল্লাহ্র জন্যে বন্ধুত্বকারী দু'ব্যক্তি যদি একজন অপরজনের কাছে লজ্জা করে, তবে কারও না কারও মধ্যে অবশ্যই রোগ থাকবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বলেন ঃ বন্ধুদের মধ্যে সে-ই নিকৃষ্টতম, যে তোমার জন্যে লৌকিকতা প্রদর্শন করে। ফলে তোমাকে তার খাতির-তোয়াজ করতে হয় এবং তা সম্ভব না হলে ওযর পেশ করার প্রয়োজন হয়। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ মানুষের মধ্যে লৌকিকতার কারণেই বিভেদ সৃষ্টি হয়। একজন অপরজনের কাছে গেলে সে তার জন্যে লৌকিকতা করে। হযরত জুনায়দ (রহঃ) বলেন ঃ আমি চার শ্রেণীর সুফী বুযুর্গগণের সাথে বাস করেছি এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে ত্রিশ ব্যক্তির সংসর্গ লাভ করেছি; অর্থাৎ হারেস মুহাসেবী ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ, হাসান সোহী ও তাঁর অনুচরবৃন্দ, সিররী সকতী ও তাঁর দল এবং ইবনে কুরায়বী ও তাঁর সহচরবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে যে কোন দুব্যক্তি পরস্পরে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং লৌকিকতা প্রদর্শন করেছে, তার

কারণ, তাদের একজনের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক রোগ ছিল।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন ঃ যে বন্ধু আমার সাথে লৌকিকতা করে, বন্ধুদের মধ্যে সেই আমার কাছে সর্বাধিক কঠিন এবং যার সাথে আমি এমনভাবে থাকি, যেমন একাকী থাকি, সে আমার কাছে সবচেয়ে হালকা বন্ধু। জনৈক সুফী বলেন ঃ এমন লোকের সাথে থাক যে, সৎকর্ম করলে তার দৃষ্টিতে বেড়ে না যাও এবং গোনাহ করলে তার কাছে তোমার মর্যাদা হ্রাস না পায়; উভয় অবস্থাতে তার কাছে সমান থাক। একথা বলার কারণ, এর ফলে লৌকিকতা ও লজ্জা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কেউ বলেন ঃ দুনিয়াদারদের সাথে আদব সহকারে থাকা উচিত, আখেরাত ওয়ালাদের সাথে জ্ঞান সহকারে এবং সাধকদের সাথে যেভাবে ইচ্ছা থাক। আর একজন বলেন ঃ এমন ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন কর যে, গোনাহ তুমি করলে তওবা সে করে এবং তার সাথে মন্দ ব্যবহার করলে উল্টা সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তোমার কষ্টের বোঝা নিজে বহন করে এবং তোমাকে কোন কষ্ট দেয় না। এ উক্তির প্রবক্তা বন্ধুত্বের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। বাস্তবে প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। এ কারণেই হযরত জুনায়দকে যখন কেউ বলল ঃ বর্তমান যুগে বন্ধু বিরল, আল্লাহ্র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করার মত ব্যক্তি কোথায়? তখন তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি তিন বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বললেন ঃ যদি এমন বন্ধু চাও যে তোমাকে কষ্ট থেকে বাঁচাবে এবং তোমার কষ্ট নিজের মাথায় তুলে নেবে, তবে এরূপ বন্ধু অবশ্যই বিরল। পক্ষান্তরে যদি এমন বন্ধু চাও, যার খেদমত তুমি করবে এবং সে কষ্ট দিলে তুমি সবর করবে, তবে আমার কাছে এরূপ লোক অনেক আছে, যার সাথে ইচ্ছা বন্ধুত্ব করতে পার। এখন জানা উচিত, মানুষ তিন প্রকার– এক, যার সংসর্গে তোমার উপকার হবে। দুই, তুমি যার কিছু উপকার করতে পারবে এবং তোমা দ্বারা তার কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু তার দ্বারা তোমার উপকারও হয় না। তিন, যার কোন উপকার তুমি করতে পার না; কিন্তু তার সংসর্গে তোমার ক্ষতি হয়। এরূপ ব্যক্তি নির্বোধ চরিত্রহীন। তার সংসর্গ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। দ্বিতীয় প্রকার মানুষ থেকে দূরে থেকো না। কেননা, তার দ্বারা দুনিয়াতে উপকার না হলেও আখেরাতে উপকার হবে। তার সুপারিশ,

দোয়া এবং তার খেদমত করার সওয়াব তুমি পাবে। প্রথম প্রকার মানুষ সর্বাবস্থায় সংসর্গের যোগ্য। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-কে এই মর্মে ওহী পাঠালেন, তুমি আমার কথা মানলে তোমার অনেক বন্ধু হয়ে যাবে। অর্থাৎ, তুমি তাদের দুঃখে দুঃখী হলে, তাদের জ্বালাতন সহ্য করলে এবং তাদের প্রতি হিংসা না করলে তারা তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি পঞ্চাশ বছর মানুষের সংসর্গে কাটিয়েছি। কখনও আমার মধ্যে ও তাদের মধ্যে কলহ হয়নি। কেননা, আমি তাদের মধ্যে নিজের ভরসায় বাস করেছি। কারও উপর বোঝা চাপাইনি। যার অভ্যাস এরূপ হবে, তার অনেক বন্ধু হবে। কষ্ট না দেয়ার আর এক উপায় হল, বন্ধুর নফল এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি ও আপত্তি না করা। কোন কোন সুফী এই শর্তে পারস্পরিক বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন যে, চারটি বিষয়ে একই রূপ থাকবে। একজন সর্বদা রোযা রাখলে অপরজন বলবে না যে, রোযা ভঙ্গ কর; একজন সর্বদা রোযা না রাখলে অপরজন বলবে না যে, রোযা রাখ; একজন সারা রাত নিদ্রা গেলে অপরজন বলবে না যে, উঠ এবং একজন সারা রাত জেগে নামায পড়লে অপরজন বলবে না যে, ঘুমাও।

জনৈক সাহাবী বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা লৌকিকতাকারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

انا والاتقياء من امتى براء من التكلف অর্থাৎ, আমি এবং আমার উম্মতের পরহেযগার লোকেরা লৌকিকতা থেকে মুক্ত।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার বন্ধুর বাড়ীতে চারটি কাজ করে, তার বন্ধুত্ব পূর্ণাঙ্গ হয়- এক; বন্ধুর বাড়ীতে পানাহার করা; দুই, পায়খানায় যাওয়া; তিন, নামায পড়া এবং চার, নিদ্রা যাওয়া। অন্য একজন বুযুর্গের সামনে এসব বিষয় আলোচনা করা হলে তিনি বললেন ঃ পঞ্চম কাজটি রয়ে গেছে। তা হল, সস্ত্রীক বন্ধুর গৃহে গেলে সেখানে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। কেননা, এই পাঁচটি কাজের জন্যেই গৃহ নির্মাণ করা হয়। নতুবা আবেদদের এবাদতের জন্যে তো মসজিদই অধিক আরামের জায়গা। এসব কাজ বন্ধুর গৃহে হয়ে গেলে বন্ধুত্ব পূর্ণাঙ্গ, লৌকিকতা দূরীভূত এবং অকপট ভাব অর্জিত হয়ে যায়। আরবের লোকেরা সালামের জওয়াবে বলে- মারহাবা, আহলান ওয়া সাহলান। এতে উপরোক্ত

বিষয়সমূহের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, 'মারহাবা' শব্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমার জন্যে আমার মনে ও গৃহে বিস্তৃত জায়গা রয়েছে। 'আহলান' শব্দের অর্থ এ গৃহ তোমার। এখানে তোমার মন বসবে। আমাদের প্রতি তোমার মনে কোন আতংক ভাব থাকবে না। 'সাহ্লান' শব্দের অর্থ, তুমি যা চাইবে, তা তোমার জন্যে সহজলভ্য হবে। তা পূর্ণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না। সহজলভ্যতা ও লৌকিকতা বর্জন এভাবে পূর্ণ হবে যে, তুমি নিজেকে বন্ধু অপেক্ষা কম মর্যাদাবান মনে করবে, তার সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখবে এবং নিজের প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। বন্ধুকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করলে বাস্তবে শ্রেষ্ঠ তুমি হবে। আবু মোয়াবিয়া আসওয়াদ বলেন ঃ আমার বন্ধু আমার চেয়ে উত্তম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ তা কেমন করে? তিনি বললেন ঃ আমার প্রত্যেক বন্ধু আমাকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করে। যে ব্যক্তি আমাকে নিজের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতি অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি তোমার জন্যে তাই পছন্দ না করে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করে, তার সংসর্গে কোন কল্যাণ নেই। সমতার দৃষ্টিতে বন্ধুকে দেখা সর্বোচ্চ স্তর এবং পূর্ণাঙ্গ স্তর হচ্ছে বন্ধুকে শ্রেষ্ঠ মনে করা। এ কারণেই হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ তোমাকে কেউ সর্বনিকৃষ্ট বললে যদি তুমি ক্রুদ্ধ হও, তবে তুমি সর্বনিকৃষ্টই বটে। অর্থাৎ, সর্বদা মনে নিকৃষ্ট হওয়ার বিশ্বাস থাকা উচিত। কেউ নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করলে বন্ধুকে হেয় মনে করবে। অথচ সাধারণ মুসলমানকেও হেয় মনে করা অনুচিত। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

يحسب المرء من الشران يحقر اخاه المسلم অর্থাৎ, মানুষের মন্দ হওয়ার জন্যে তার মুসলমান ভাইকে হেয় মনে করাই যথেষ্ট।

লৌকিকতা বর্জনের এক উপায় হল নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের পরামর্শ মেনে নেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ অর্থাৎ, কাজকর্মে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ

গ্রহণ কর। নিজের কোন রহস্য বন্ধুদের কাছে গোপন করবে না।

মাওলানা ইয়াকুব কারখী বলেন ঃ আসওয়াদ ইবনে সালেম আমার পিতৃব্য হযরত মারূফ কারখীর বন্ধু ছিলেন। তিনি একবার এসে তাঁকে বললেন – বিশর ইবনে হারেস আপনার সাথে মহব্বতের বন্ধন স্থাপন করতে চান। তিনি আপনার সামনা সামনি এ কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন, তাই আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ, আপনি তাঁর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করে নিন এভাবে যে, আপনি জানেন অথবা তিনি। তিনি এমন মহব্বত চান, যা তিনি সওয়াবের কারণ বলে জানেন এবং ধর্তব্য বলে স্বীকার করেন। এ জন্যে তিনি কয়েকটি শর্ত করেন।

এক, মহব্বতের এ ব্যাপারটি জানাজানি না হওয়া চাই। দুই, আপনার ও তার মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়া চাই। কারণ, তিনি অধিক সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। হযরত মারূফ বললেন ঃ ভাই! আমি যখন কাউকে মহব্বত করি, তখন দিবারাত্র তার বিচ্ছেদ চাই না এবং সর্বক্ষণ তার সাথে দেখা করি। সর্বাবস্থায় তাঁকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেই। অতঃপর হযরত মারূফ ভ্রাতৃত্বের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণনা করলেন। বক্তব্যের মাঝখানে বললেন ঃ নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী মুর্তযার সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ফলে তাঁকে জ্ঞানগরিমায় শরীক করেছিলেন। কোরবানীর জন্তু তাঁকে বণ্টন করে দিয়েছিলেন এবং নিজের প্রিয়তমা কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। এসব কিছুর কারণ কেবল বন্ধুত্বই ছিল। যেহেতু তুমি বিশরের আবেদন নিয়ে আমার কাছে এসেছ, তাই আমি তোমাকে সাক্ষী করে বলছি– আমি তার সাথে এই শর্তে আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করলাম, তিনি যদি আমার সাথে দেখা করা অপছন্দ করেন, তবে যেন আমার সাথে দেখা করতে না আসেন, কিন্তু আমার মন যখনই চাইবে, আমি তাঁকে দেখতে চলে যাব। আমরা যেখানে মিলিত হই, তিনি যেন সেখানে আমার সাথে দেখা করেন। তিনি যেন কোন ভেদ আমার কাছে গোপন না করেন এবং সকল অবস্থা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। অতঃপর আসওয়াদ ইবনে সালেম এসব কথাবার্তা বিশরের কাছে গিয়ে বললে তিনি আনন্দিত হলেন এবং তাঁর সব কথা মেনে নিলেন।

উপরে আমরা বন্ধুত্বের যাবতীয় হক সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। এসব পূর্ণরূপে তখন আদায় হয়, যখন আদায় করার মধ্যে বন্ধুদের উপকার এবং তোমার ক্ষতি হয়। এমনভাবে আদায় করা যাবে না, যাতে তোমার উপকার এবং বন্ধুদের অপকার হয়। আর একটি কাজ করা উচিত। তা হচ্ছে, তুমি নিজেকে বন্ধুদের খাদেমের স্থলাভিষিক্ত মনে করবে এবং নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাদের অধিকার আদায়ে নিয়োজিত রাখবে। উদাহরণতঃ চক্ষু দ্বারা তাদেরকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখবে, যাতে তারা এটা বুঝতে পারে। তাদের গুণাবলী দেখবে এবং দোষ-ত্রুটি থেকে অন্ধ হয়ে যাবে। তারা তোমার দিকে মুখ করে কথা বললে তুমি দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নেবে না।

বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে যারা বসত, তিনি তাদের প্রত্যেককে আপন মোবারক চেহারার ভাগ দিতেন। অর্থাৎ, প্রত্যেকের দিকে মুখ ফেরাতেন। যে কেউ তাঁর কথা শুনত, সে-ই মনে করত, তার প্রতি তাঁর সর্বাধিক কৃপাদৃষ্টি রয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর মজলিস লজ্জা, বিনয় ও বিশ্বস্ততার মজলিস ছিল। তিনি নিজের বন্ধুদের সামনে সর্বাধিক হাসতেন। সহচরেরা যে বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করত, তিনি তাতে অধিক বিস্ময় প্রকাশ করতেন। মুখের সাথে সম্পর্কশীল হকসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কান সম্পর্কিত হক, বন্ধু যখন কিছু বলবে, তখন তার কথা সাগ্রহে শুনবে; তাকে সত্য মনে করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং আপত্তি উত্থাপন করে কথা কেটে দেবে না। কোন কারণে কথা শুনতে না পারলে ওযর পেশ করবে। বন্ধুর অপ্রিয় কথাবার্তা শ্রবণ থেকে কানকে বাঁচিয়ে রাখবে। হাত সম্পর্কিত হক হচ্ছে, হাতে সম্পন্ন করা হয় এমন বিষয়াদিতে বন্ধুদের সাহায্য করবে। পা সম্পর্কিত হক হচ্ছে, পায়ের দ্বারা বন্ধুদের পেছনে খাদেমের ন্যায় চলবে। যতটুকু তারা আগে বাড়ায় তাদের থেকে ততটুকু আগে বাড়বে এবং তারা যতটুকুই নৈকট্য দেয়; ততটুকুই নিকটে থাকবে । তারা বৈঠকে আগমন করলে তাদের সম্মানে দাঁড়াবে এবং যে পর্যন্ত তারা না বসে, তুমি বসবে না। যেখানে জায়গা থাকবে সেখানেই বসে যাবে। পূর্ণ একাত্মতা হয়ে গেলে এসব হকের মধ্যে কতক সহজও হয়। যেমন, দাঁড়ানো, ওযর পেশ করা ইত্যাদি। লৌকিকতা লুপ্ত

হয়ে গেলে বন্ধুদের সাথে সেই ব্যবহারই করা হয়, যা নিজের সাথে করা হয়। কেননা, এই বাহ্যিক আদবসমূহ অন্তরের পরিচ্ছন্নতার শিরোনাম। অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেলে এসব বাহ্যিক আদবের প্রয়োজন থাকে না। যে ব্যক্তির দৃষ্টি সৃষ্টির সংসর্গের দিকে থাকে, সে কখনও বক্র হয়, কখনও সোজা। পক্ষান্তরে যার দৃষ্টি স্রষ্টার দিকে থাকে, সে বাহ্যতঃ সোজা থাকে এবং অন্তরকে মহব্বত ও সৃষ্টির মহব্বত দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। কেননা, বান্দার খেদমত আল্লাহর ওয়াস্তে খেদমতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ। সচ্চরিত্রতা ছাড়া এটা মানুষ অর্জন করতে পারে না।

বন্ধুত্ব সম্পর্কে মনীষী উক্তি ঃ যদি তুমি উত্তমরূপে মেলামেশা করতে চাও, তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অনুশীলন কর।

বন্ধু ও শত্রুর সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ কর। তাদেরকে হেয় করো না এবং নিজে ভীত হয়ো না। গাম্ভীর্য অবলম্বন কর– এতটুকু নয় যে, অহংকার হয়ে যায়। বিনয়ী হও– এতটুকু নয় যে, লাঞ্ছিত হয়ে যাও। সকল কাজে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর। বাহুল্য ও স্বল্পতা সকল কাজেই নিন্দনীয়। নিজের দু'দিকে বার বার মুখ ফিরিয়ে দেখো না। যখন বস, সস্থিরে বস, যাতে মনে না হয় যে, তুমি প্রস্থানোদ্যত। অঙ্গুলি ফুটিয়ো না এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি নিয়ে খেলা করো না। নাকে অঙ্গুলি ঢুকিয়ো না। বার বার থুথু নিক্ষেপ করো না এবং বার বার নাক পরিষ্কার করো না। জনসমক্ষে অধিক হাই তুলো না, এমনকি, নামায এবং একাকিত্বেও। মজলিসে হৈ চৈ করো না। কথা লাগাতার ও সাজিয়ে বল, কেউ ভাল কথা বললে তা মনোযোগ দিয়ে শুন। মহিলাদের ন্যায় খুব সাজগোজ করো না এবং গোলামদের মতো নোংরা থেকোনা। সুরমা ও তৈল অধিক ব্যবহার করো না। অত্যাচারীকে বীর বলো না। আপন স্ত্রী-পুত্রের কাছেও নিজের অর্থসম্পদের পরিমাণ ব্যক্ত করো না– অন্যদের তো কথাই নেই। কেননা, তাদের ধারণায় ধন-সম্পদ কম হলে তুমি তাদের দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যাবে; পক্ষান্তরে বেশী হলে তারা কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে না। তাদেরকে এতটুকু ভীতিগ্রস্ত করো না যাতে তোমার কাছেও না ঘেঁষে এবং এত সোহাগও করো না যাতে মাথায় চড়ে বসে। গোলাম ও চাকরদের সাথে হাসিঠাট্টা করো না। এতে তোমার গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হবে।

যদি বাদশাহ্ তোমাকে নৈকট্য দান করে তবে তার সাথে এমনভাবে থাক, যেন বর্শার ফলার উপর আছ। বাদশাহ তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকলে মনে করো না কোন সময় অপ্রসন্ন হবে না। তার পরিবর্তনকে ভয় করতে থাক। তার সাথে এমন কথাবার্তা বল, যা সে আশা করে। তাকে তোমার প্রতি কৃপাশীল দেখে তার স্ত্রী-পুত্র ও চাকরদের ব্যাপারে দখল দিয়ো না। কেননা, যে বাদশাহের পারিবারিক ব্যাপারে দখল দেয়, সে এমনভাবে ভূমিসাৎ হয়, যে কখনও উঠে দাঁড়াতে পারে না। সুসময়ের বন্ধু থেকে বেঁচে থাক। কেননা, সে শত্রুর চেয়ে ভয়ংকর।

কোন মজলিসে গেলে প্রথমে সালাম কর। যারা পূর্বে এসেছে, তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে যেয়ো না; বরং যেখানে খালি জায়গা দেখ, সেখানে বসে পড়। বসার সময় যে নিকটে থাকে তাকে সালাম কর।

পথিমধ্যে প্রথমতঃ বসা উচিত নয়। যদি বস, তবে দৃষ্টি নত রাখ। মজলুমের সাহায্য কর এবং কেউ পথ ভুলে গেলে তাকে পথ বলে দাও। সালামের জওয়াব দাও। কেউ সওয়াল করলে তাকে কিছু দান কর। সৎ কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজে বাধা দাও। থুথু ফেলার জন্যে জায়গা তালাশ কর। কেবলার দিকে এবং ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ করো না, বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে নিক্ষেপ কর।
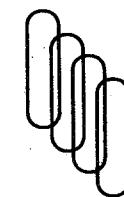
তৃতীয় পবিরচ্ছেদ
সাধারণ মুসলমান ভাই ও প্রতিবেশীর হক

মানুষ সামাজিক জীব। অপরের সাথে মেলামেশা না করে একাকী জীবন ধারণ করা তার পক্ষে সুকঠিন। তাই মেলামেশার নিয়মনীতি শিক্ষা করা জরুরী। অপরের সাথে তার হক পরিমাণে আদব বজায় রাখা উচিত। আর হক হয়ে থাকে সম্পর্কের পরিমাণে। সম্পর্ক হয় আত্মীয়তার হবে, যা সবচেয়ে খাস; না হয় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের হবে, যা সবচেয়ে ব্যাপক; না হয় প্রতিবেশিত্ব কিংবা সফর অথবা পাঠশালার সংসর্গের। এসব সম্পর্কের মধ্যে প্রত্যেকটির অনেক স্তর রয়েছে। উদাহরণতঃ আত্মীয় মাহরাম (মহিলাদের এমন আত্মীয়, যার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) হলে তার হক অধিক। মাহরামের চেয়েও অধিক হক পিতামাতার। অনুরূপভাবে প্রতিবেশীর হক গৃহের নিকটত্ব ও দূরত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন হয়ে থাকে। মুসলমান ভাইয়ের হকের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তার সাথে পরিচয় যত গভীর হবে, হকও তত বেশী হবে। উদাহরণতঃ যার সঙ্গে শুনে পরিচয় লাভ করা হয়, তার হকের তুলনায় সে ব্যক্তির হক বেশী হবে, যার সাথে মুখোমুখি পরিচয় আছে। পরিচয়ের পর মেলামেশার মাধ্যমে হক অধিক সুদৃঢ় হয়ে যায়। এমনিভাবে সংসর্গের স্তরও বিভিন্ন রূপ। উদাহরণতঃ পাঠশালার সংসর্গের হক সফরের সংসর্গের হকের তুলনায় অধিক জোরদার। বন্ধুত্বের অবস্থাও তদ্রূপ। বন্ধুত্ব শক্তিশালী হয়ে গেলে তা ভ্রাতৃত্বে পরিণত হয়। আরও বৃদ্ধি পেলে তা হয় মহব্বত এবং আরও সম্প্রসারিত হলে হয়ে যায় 'খুল্লত'। এ থেকে জানা গেল, খলীল হাবীবের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী। কেননা, হাবীব তাকে বলে যে অন্তরে স্থান করে নেয় এবং খলীল তাকে বলে যে শিরা-উপশিরায় গ্রথিত হয়ে যায়। অতএব যে খলীল হবে সে হাবীবও হবে। কিন্তু কেউ হাবীব হলে খলীলও হবে না। অভিজ্ঞতার আলোকে বন্ধুত্বের বিভিন্ন স্তর থাকা সুস্পষ্ট। খুল্লতকে আমরা ভ্রাতৃত্বের উপরে বলেছি। এর অর্থ, যে অবস্থাকে খুল্লত বলা হয় তা ভ্রাতৃত্বের অবস্থার তুলনায় পূর্ণাঙ্গতম। এটি আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ থেকে জানতে পারি। তিনি বলেছেন ঃ

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابابكر خليلا ولكن

صاحبكم خليل الله ـ

অর্থাৎ, যদি আমি কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে খলীল করতাম। কিন্তু আমি হলাম আল্লাহ তা'আলার খলীল। কেননা, খলীল তাকে বলা হয়, প্রিয়জনের মহব্বত যার অন্তরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনুপ্রবেশ করে এবং সমগ্র অন্তরকে বেষ্টন করে নেয়। নবী করীম (সাঃ)-এর অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে খোদায়ী মহব্বত ছাড়া অন্য কোন মহব্বত বেষ্টন করেনি। তাই তাঁর খুল্লতে কারও অংশীদারিত্ব হতে পারেনি; অথচ তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে ভাই করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ

يا على انت منى بمنزلة هارون من موسى الا النبوة ـ

অর্থাৎ, হে আলী, তুমি আমার কাছে এমন, যেমন মূসা (আঃ)-এর কাছে হারুন ছিলেন; তবে হারুন নবী ছিলেন, তুমি নবী নও; এই যা তফাৎ।

এখানে তিনি হযরত আলীর জন্যে নবুওয়ত অস্বীকার করেছেন, যেমন হযরত আবু বকরের জন্যে খুল্লত অস্বীকার করেছেন। সুতরাং হযরত আবু বকর সিদ্দীক ভ্রাতৃত্বে হযরত আলী মুর্তযার সাথে শরীক। তবে আত্মীয়তা ও খুল্লতের যোগ্যতা উভয়টি তাঁর অর্জিত ছিল, যা হযরত আলীর ছিল না। রসূলে করীম (সাঃ) একাধারে আল্লাহ তা'আলার খলীল ও হাবীব দুইই ছিলেন। বর্ণিত আছে, তিনি একদিন হর্ষোৎফুল্ল বদনে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে খলীল পদে বরণ করেছেন, যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে করেছিলেন। সুতরাং আমি আল্লাহ তা'আলার হাবীব এবং তাঁর খলীল। এ বক্তব্য থেকে জানা গেল, সম্পর্ক শুরু হয় পরিচয় থেকে। এর আগে কোন সম্পর্ক নেই এবং খুল্লতের পরে বন্ধুত্বের কোন স্তর নেই। এগুলো ছাড়া অন্যান্য যেসব স্তর রয়েছে, সেগুলো মধ্যবর্তী স্তর। বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের হক ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মহব্বত এবং খুল্লতের হকও এগুলোরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মহব্বত ও ভ্রাতৃত্বের স্তরে যে পরিমাণে পার্থক্য হয়, সে পরিমাণে এগুলোর হকের স্তরেও তফাৎ হয়ে থাকে। চূড়ান্ত হক হল প্রিয়জনকে নিজের প্রাণ ও ধন সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া; যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের

প্রাণ ও যাবতীয় ধনৈশ্বর্য রসূলে করীম (সাঃ)-এর পদতলে লুটিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) নিজের দেহকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে ঢাল করেছিলেন। এখন আমরা মুসলমান ভাই, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও গোলাম চাকরদের হক চারটি বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করতে চাই।

মুসলমান ভাইয়ের হক ঃ মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম বলবে। আহ্বান করলে সাড়া দেবে। হাঁচি দিলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। পীড়িত হলে দেখতে যাবে। মরে গেলে জানাযায় হাযির হবে। তোমার ব্যাপারে কসম খেলে তার কসম বাস্তবায়িত করবে। উপদেশ চাইলে উত্তম উপদেশ দেবে। পশ্চাতে তাকে মন্দ বলবে না; তার জন্যে তা-ই পছন্দ করবে যা নিজের জন্যে পছন্দ করবে এবং তাই অশুভ মনে করবে যা নিজের জন্যে অশুভ মনে করবে। এসব বিষয় হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মুসলমানের হকসমূহের মধ্যে চারটি বিষয় তোমার জন্যে অপরিহার্য। এক, সৎকর্মীকে সাহায্য করা; দুই, যে পাপ করে তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা; তিন, যে হতভাগা তার জন্যে দোয়া করা এবং চার, যে তওবা করে, তাকে মহব্বত করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার উক্তি رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (তারা পরস্পরে অনুকম্পাশীল)– এর অর্থ, এই উম্মতের কোন অসৎ কর্মী ব্যক্তি কোন সৎ কর্মীকে দেখে এরূপ দোয়া করবে– ইলাহী, তুমি তাকে প্রদত্ত কল্যাণে বরকত দান কর, একে তার জন্যে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং তার ফায়দা আমাকে দান কর। পক্ষান্তরে সৎ ব্যক্তি অসৎ ব্যক্তিকে দেখে এরূপ দোয়া করবে– ইলাহী, তাকে হেদায়াত কর, তওবার তওফীক দাও এবং তার পাপ মার্জনা কর।

নোমান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مثل المؤمنين فى ودهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا منه تداعى سائره بالحمى والسهر -

অর্থাৎ, পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও কৃপার ক্ষেত্রে মুমিনরা এক দেহের মত। যখন দেহের কোন অংশ ব্যথাযুক্ত হয়, তখন সর্বাঙ্গে জ্বর ও অনিদ্রার

কারণ দেখা দেয়। হযরত আবু মূসার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে–

المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا -

অর্থাৎ, ঈমানদার ঈমানদারের জন্যে দালানের ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে। মুসলমান ভাইয়ের একটি হক হচ্ছে তাকে কথা ও কাজের দ্বারা কষ্ট না দেয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده -

অর্থাৎ, সে-ই প্রকৃত মুসলমান যার হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। অন্য এক দীর্ঘ হাদীসে এরশাদ হয়েছে– তুমি যদি এসব কাজ করতে না পার, তবে এতটুকুই কর যে, মানুষের অনিষ্ট করো না। এটা হবে তোমার পক্ষ থেকে একটি সদকা। এক হাদীসে বলা হয়েছে– তোমরা কি জান মুসলমান কে? লোকেরা আরজ করল ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ মুসলমান সে ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। লোকেরা আরজ করল ঃ তা হলে মুমিন কে? তিনি বললেন ঃ যার তরফ থেকে অন্য মুমিনের জান ও মাল নিরাপদ থাকে। লোকেরা বলল ঃ মুহাজির কে? তিনি বললেন ঃ যে মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে এবং তা থেকে বিরত থাকে। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ ইসলাম কি? তিনি বললেন ঃ তোমার অন্তর যদি আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাবহ হয় এবং তোমার হাত ও জিহ্বা থেকে যদি অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, তবে তাই ইসলাম। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ দোযখীদের উপর খোস-পাঁচড়া চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে অধিক চুলকানোর কারণে তাদের কারও অস্থি বেরিয়ে পড়বে এবং ত্বক ও মাংস উড়ে যাবে। তাকে কেউ নাম ধরে ডাকবে এবং জিজ্ঞেস করবে ঃ তুমি কি কষ্ট পাচ্ছ? সে বলবে ঃ হাঁ, খুব কষ্ট পাচ্ছি। তখন বলা হবে– তুমি যে মুমিনদেরকে জ্বালাতন করতে, এটা তারই শাস্তি। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে সানন্দে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে দেখেছি। দুনিয়াতে সে পথ থেকে একটি বৃক্ষ কেটে দিয়েছিল, যা পথিকদের জন্যে কষ্টের কারণ ছিল। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম, আমাকে কিছু শিক্ষা দিন, যা পালন করে উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন ঃ

اعزل الاذى عن طريق المسلمين - অর্থাৎ, মুসলমানদের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– যে কেউ মুসলমানদের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্যে একটি পুণ্য লেখবেন, যার ফলস্বরূপ তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। আরও বলা হয়েছে, মুসলমান ভাইয়ের প্রতি কষ্টদায়ক দৃষ্টিতে ইশারা করা হালাল নয়। রবী ইবনে খায়সাম বলেন ঃ মানুষ দু'রকম। এক, ঈমানদার। তাকে কষ্ট দিয়ো না এবং দুই মূর্খ। তার সাথে মূর্খ হয়ো না।

মুসলমানের প্রতি বিনয়ী হওয়া এবং অহংকার না করাও একটি হক। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ অর্থাৎ, আল্লাহ কোন অহংকারী গর্বিতকে পছন্দ করেন না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি ওহী করেছেন, কেউ যেন কারও সাথে গর্ব না করে। কেউ গর্ব করলে সহ্য করা উচিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সাঃ)-কে বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ - অর্থাৎ, মার্জনা করুন, সৎ কাজের আদেশ করুন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

ইবনে আবী আওফা রেওয়ায়েত করেন ঃ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايانف ولايتكبر ان يمشي مع الارملة والمسكين فيقضي حاجته -

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গর্ব অহংকার করতেন না। তিনি বিধবা ও মিসকীনদের কাছে গিয়ে তাদের অভাব অনটন দূর করতেন।

এক মুসলমানের নিন্দা অন্য মুসলমানের কাছে না করা এবং একজনের কাছে যা শুনে তা অন্যের কাছে না পৌঁছানোও একটি হক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لايدخل الجنة قتات অর্থাৎ, যে পরোক্ষে অপরের নিন্দা করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

খলীল ইবনে আহমদ বলেন ঃ যে তোমার কাছে অপরের নিন্দা বলবে, সে তোমার নিন্দা অপরের কাছে বলবে। আর যে তোমার কাছে অপরের খবর বলবে, সে তোমার খবরও অপরের কাছে বলবে।

আর একটি হক হল, পরিচিতজনের সাথে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তিন দিনের বেশী সাক্ষাৎ বর্জন করবে না। আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন–

لايحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلث ملقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما يبدأ بالسلام -

অর্থাৎ, কোন মুসলমানের জন্যে তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী পরিত্যাগ করা কিংবা পরস্পর দেখা হলে একজনের এদিকে এবং অন্যজনের ওদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখা জায়েয নয়। তাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম করবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ

من اقال مسلما عشرته اقاله الله يوم القيامة অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ত্রুটি মার্জনা করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার ত্রুটি মার্জনা করবেন।

হযরত ইকরিমা বলেন– আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বললেন ঃ তুমি তোমার ভাইদের অপরাধ মার্জনা করে দিয়েছ, তাই আমি তোমার আলোচনা আলোচকদের মাঝে সমুন্নত করে দিলাম।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ

ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله -

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের জন্যে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর সম্মান বিনষ্ট করা হলে তিনি সে জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে মার্জনা করেছে, তখন আল্লাহ তাআলা তার সম্মানই বৃদ্ধি করেছেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ما نقص مال من صدقة وما زاد الله رجلا بعفو الاعز او

ما من احدتواضع الله الا رفعه الله ـ

অর্থাৎ, সদকা করার কারণে সম্পদ হ্রাস পায় না। কেউ মার্জনা করলে আল্লাহ কেবল তার সম্মানই বৃদ্ধি করেন। যে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উচ্চতাই দান করেন।

আর একটি হক হল, সম্ভব হলে সাধ্যমত সকলের প্রতি অনুগ্রহ করা। এ ব্যাপারে কে অনুগ্রহের যোগ্য এবং কে অযোগ্য, তা দেখবে না। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের বংশ পরম্পরায় বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে অনুগ্রহের যোগ্য, তার প্রতিও অনুগ্রহ কর এবং যে যোগ্য নয়, তার প্রতিও অনুগ্রহ কর। কেননা, যার প্রতি অনুগ্রহ করবে, সে যদি যোগ্য না হয়, তবে তুমি তো অনুগ্রহ করার যোগ্য। একই সিলসিলা থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে– ঈমানের পর বিবেকের চাহিদা হচ্ছে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং প্রত্যেক সৎ অসৎ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র হাত ধরে ফেললে যতক্ষণ সে নিজেই না ছাড়ত, তিনি নিজের হাত ছাড়াতেন না। তাঁর উরু সহচরদের উরু থেকে এগিয়ে আছে বলে মনে হত না। কেউ তাঁর সাথে কথা বললে তিনি তার দিকে মুখ ফেরিয়ে রাখতেন এবং যতক্ষণ কথা শেষ না হত, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাতেন না। আর একটি হক হল কোন মুসলমানের কাছে তার অনুমতি ছাড়া না যাওয়া। তিন বার অুনমতি চাওয়ার পর যদি অনুমতি দেয়, তবে ভাল। অন্যথায় ফিরে আসবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ অনুমতি তিন বার চাইতে হবে। প্রথমবার সে চুপ করে থাকবে। দ্বিতীয় বার প্রবেশ করার ব্যাপারে পরামর্শ করবে এবং তৃতীয়বার হয় অনুমতি দেবে, না হয় ফিরে যেতে বলবে।

আর একটি হক হচ্ছে, সকল মানুষের সাথে মধুর ব্যবহার করবে এবং প্রত্যেকের সাথে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলবে। মূর্খের সাথে জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা বললে নিজেও কষ্ট পাবে এবং অপরকেও কষ্ট দেবে।

বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ করাও একটি হক। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ـ

অর্থাৎ, সে আমার দলভুক্ত নয়, যে বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের প্রতি দয়া করে না। ছোটদেরকে স্নেহ করা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রীতি । এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– বয়োবৃদ্ধ মুসলমানের সম্মান করা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শামিল। বয়োবৃদ্ধদের সম্মান করার পরিশিষ্ট হল, অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের সামনে কথা না বলা। সেমতে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন– জোহায়নিয়া গোত্রের এক কাফেলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তাদের মধ্যে থেকে একটি বালক কথা বলার জন্যে দণ্ডায়মান হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ থাম। বয়স্ক লোক কোথায়? সে কথা বলুক। এক হাদীসে বলা হয়েছে– যে যুবক কোন বৃদ্ধের সম্মান করে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে বৃদ্ধের বয়স পর্যন্ত পৌছার পর কাউকে ঠিক করে দেন, যে তার সম্মান করে। এতে দীর্ঘ জীবন লাভের সুসংবাদ রয়েছে এবং এতে জানা যায়, বৃদ্ধের সম্মান করার তওফীক সে-ই পায়, আল্লাহ্ তাআলা যার জন্যে দীর্ঘ জীবন লেখে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফর থেকে এলে শিশুরা তাঁর সাথে দেখা করতে যেত। তিনি তাদের কাছে অবস্থান করতেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, শিশুদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারা কাছে এলে তিনি সওয়ারীতে কাউকে আগে এবং কাউকে পেছনে বসিয়ে নিতেন। এর পর সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন– তোমরাও শিশুদেরকে সওয়ারীতে তুলে নাও। পরে শিশুরা এ নিয়ে গর্ব করত এবং একে অপরকে বলত ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সওয়ারীতে নিজের সামনে বসিয়েছেন এবং তোকে পেছনে। দোয়া, বরকত ও নাম রাখার জন্যে যে সকল শিশুকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আনা হত, তিনি তাদেরকে নিজের কোলে শুইয়ে দিতেন। প্রায়ই সেসব শিশু তাঁর গায়ে পেশাব করে দিত। কেউ শিশুকে ভয় দেখালে তিনি বলতেন– শিশুর পেশাব বন্ধ করো না; তাকে পেশাব করতে দাও। অবশেষে শিশু পূর্ণরূপে পেশাব করে নিত। অতঃপর তিনি দোয়া করতেন এবং তার নাম রাখতেন। এতে শিশুর পরিবারের লোকেরা আনন্দিত হত এবং এমন

ধারণা করত না যে, শিশুর পেশাবের কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কষ্ট পেয়েছেন। তারা শিশুকে নিয়ে চলে গেলে তিনি পেশাব ধুয়ে নিতেন।

সকলের সাথে হাসি-খুশী থাকা এবং নম্র কথা বলাও একটি হক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা কি জান দোযখ কার জন্যে হারাম? তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ তার জন্যে হারাম, যে নম্র, ভদ্র ও মিশুক। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা সদা প্রফুল্ল ব্যক্তিকে ভালবাসেন। জনৈক ব্যক্তি আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এমন আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে দাখিল করাবে। তিনি বললেন ঃ সালাম দেয়া ও সুন্দর কথা বলা মাগফেরাতের অন্যতম কারণ। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة -

অর্থাৎ, তোমরা একখণ্ড শুষ্ক খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। যদি তাও না পাও তবে পবিত্র কথাবার্তা দিয়ে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ জান্নাতের কয়েকটি বাতায়ন আছে, তা দ্বারা বাইরের বস্তু ভিতর থেকে এবং ভিতরের বস্তু বাইরে থেকে দেখা যায়। জনৈক বেদুঈন আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এগুলো কাদের জন্যে? তিনি বললেন ঃ যে ভালরূপে কথা বলে, নিরন্নকে অন্ন দেয় এবং রাতের বেলায় তখন নামায পড়ে, যখন মানুষ ঘুমে বিভোর থাকে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল বলেন ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন– আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে, ওয়াদা পূর্ণ করবে, আমানত আদায় করবে, সত্যবাদিতা অবলম্বন করবে, প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এতীমের প্রতি দয়া করবে, সালাম করবে এবং বিনয়ী হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক মহিলা পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এসে বলল ঃ আমি কিছু আরজ করতে চাই। তাঁর সঙ্গে তখন কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। তিনি মহিলাকে বললেন ঃ তুমি গলির যেদিকে ইচ্ছা বসে যাও। আমি কাছে বসে তোমার কথা শুনে নেব। মহিলা তাই করল। তিনি কাছে বসে তার কথাবার্তা শুনলেন। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সত্তর বছর রোযা রাখল। সে প্রতি সপ্তম দিনে ইফতার করত। সে আল্লাহ তাআলার

কাছে প্রার্থনা করল ঃ ইলাহী, আমাকে দেখাও, শয়তান কিভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে? অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন তার প্রার্থনা কবুল হল না, তখন সে বলল ঃ আমার ও আমার পালনকর্তার ব্যাপারে যে অন্যায় আমি করেছি, তা জানতে পারলে সেটা আমার এই প্রার্থনার চেয়ে উত্তম হত। তখন আল্লাহ তাআলা তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা বলল ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমার এ উক্তিটি আমার কাছে তোমার অতীত এবাদতের তুলনায় উত্তম। আল্লাহ তোমার চক্ষু খুলে দিয়েছেন। এখন দেখে নাও। সে দেখল, মানুষের মধ্যে এমন কেউ নেই যার চারপাশে শয়তানরা মাছির মত ভন্ ভন্ করছে না। সে আরজ করল ঃ ইলাহী, এই শয়তানদের থেকে কে বেঁচে থাকে? এরশাদ হল ঃ পরহেযগার এবং নম্র ব্যক্তি।

মুসলমানের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করাও একটি হক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ওয়াদা একটি দান। তিনি আরও বলেন ঃ ওয়াদা একটি ঋণ। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

ثلاث فى المنافق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان

অর্থাৎ, মোনাফেকের মধ্যে তিনটি অভ্যাস রয়েছে– সে যখনই কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখনই ওয়াদা করে, খেলাফ করে এবং যখনই আমানত প্রাপ্ত হয়, খেয়ানত করে। অন্য এক হাদীসে আছে–

ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صلى وصام اذا حدث كذب الخ

অর্থাৎ, তিনটি অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যায় সে মোনাফেক, যদিও নামায পড়ে এবং রোযা রাখে। যখনই সে কথা বলে, মিথ্যা বলে ------।

আর একটি হক রয়েছে। তা হল, তুমি মুসলমান ভাইয়ের সাথে সে কাজই করবে, যে কাজ তুমি মুসলমান ভাইয়ের পক্ষ থেকে তোমার জন্য কামনা কর। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি অভ্যাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বান্দার ঈমান পূর্ণ হয় না। প্রথম, দারিদ্র্য সত্ত্বেও আল্লাহর

পথে ব্যয় করা। দ্বিতীয়, আপন নফসের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া। তৃতীয়, সালাম করা। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- যে ব্যক্তি দোযখ থেকে দূরে থাকা এবং জান্নাতে দাখিল হওয়া পছন্দ করে, তার উচিত এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কলেমার সাক্ষ্য দেয় এবং মানুষের সাথে এমন কাজ করে, যে কাজ মানুষ তার সাথে করাটা সে আশা করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু দারদাকে বললেন ঃ সহচরদের সাথে উত্তমরূপে উঠাবসা কর, তুমি ঈমানদার হয়ে যাবে। মানুষের জন্যে তাই পছন্দ কর যা নিজের জন্যে পছন্দ কর তা হলে তুমি মুসলমান হয়ে যাবে। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে এই মর্মে ওহী পাঠিয়েছেন যে, চারটি কাজ কর, যা তোমার জন্যে এবং তোমার সন্তানদের জন্যে সকল কাজের মূল। তন্মধ্যে একটি বিশেষভাবে আমার জন্যে, একটি বিশেষভাবে তোমার জন্যে, একটি আমার ও তোমার জন্যে অভিন্ন এবং একটি তোমার ও মানুষের জন্যে অভিন্ন। যে কাজটি বিশেষভাবে আমার জন্যে, তা হচ্ছে, তুমি আমার এবাদত করবে এবং কাউকে আমার শরীক সাব্যস্ত করবে না। যে কাজটি বিশেষভাবে তোমার জন্যে, তা হচ্ছে, তোমার আমল, যার প্রতিদান আমি তোমাকে গুরুতর প্রয়োজনের সময় দেবে। যে কাজটি তোমার ও আমার জন্যে অভিন্ন, তা হচ্ছে, তুমি দোয়া করবে, আর আমি তা কবুল করব। যে কাজটি তোমার ও মানুষের জন্যে অভিন্ন, তা হল, তুমি তাদের সাথে এমন কাজ করবে, যা তারা তোমার সাথে করুক বলে তুমি আশা কর। হযরত মূসা (আঃ) প্রার্থনা করলেন ঃ ইলাহী, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ কে? আল্লাহ বললেন ঃ যে মানুষের বিনিময় নিজের কাছ থেকে নেয়।

আর একটি হক হল, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আকার আকৃতি দ্বারা যে ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদাবান প্রতিভাত হয়, তুমি তার বেশী সম্মান করবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করবে। বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এক সফরে এক মনযিলে অবতরণ করলেন। এমন সময় জনৈক ভিক্ষুক উপস্থিত হল। তিনি খাদেমকে বললেন ঃ এই মিসকীনকে একটি রুটি দিয়ে দাও। এর পর জনৈক অশ্বারোহী আগমন করল। তিনি খাদেমকে বললেন ঃ তাকে ডাক এবং খানা খাইয়ে দাও। লোকেরা আরজ করল ঃ মিসকীনকে তো আপনি

একটি রুটি দিয়ে বিদায় করলেন আর এই অশ্বারোহীকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। এটা কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে মর্যাদা সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরও উচিত তাদেরকে সেই মর্যাদায় রাখা। মিসকীন লোকটি রুটি পেয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এই ধনী ব্যক্তিকে একটি রুটি দিয়ে দেয়া আমি সমীচীন মনে করিনি। বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার এক কক্ষে তশরীফ নিয়ে গেলে সাহাবায়ে কেরাম এত অধিক সংখ্যায় সেখানে জমায়েত হলেন যে, কক্ষে তিল ধারণের জায়গাও রইল না। এর পর জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী সেখানে এলেন। তিনি ভিতরে জায়গা নেই দেখে দহলিজে বসে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পবিত্র চাদরটি তার কাছে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন ঃ চাদরে বসে পড়। জরীর চাদরটি হাতে নিয়ে চোখে লাগালেন এবং চুম্বন করে অশ্রু বিসর্জন করলেন। অতঃপর চাদরটি ভাঁজ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ হুযুর, আপনার পবিত্র কাপড়ের উপর বসার যোগ্য আমি নই। আল্লাহ তাআলা আপনাকে ইযযত দিন, যেমন আপনি আমাকে ইযযত দিয়েছেন। এর পর রসূলে আকরাম (সাঃ) ডানে বামে চোখ বুলিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কাছে কোন সম্প্রদায়ের নেতা আগমন করলে তোমরা তার সম্মান করো। অনুরূপভাবে কারও উপর কারও পুরাতন হক থাকলে তার সম্মান করাও জরুরী। বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ধাত্রী মাতা হালিমা তাঁর কাছে আগমন করলে তিনি তাঁর জন্যে নিজের চাদর বিছিয়ে দেন এবং বলেন ঃ মা, আমার কাছে এসে খুব ভাল করেছেন। এর পর তাকে চাদরে বসিয়ে বললেন ঃ সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ কবুল করব। যা চাইবেন তাই দেব। হালিমা বললেন ঃ আমি আমার সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য সুপারিশ করছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমার ও বনী হাশেমের অংশে যে পরিমাণ লোক পড়বে, আমি তাদেরকে আপনার হাতে সমর্পণ করব। এর পর চতুর্দিক থেকে সাহাবায়ে কেরামের আওয়ায উঠল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমরাও আমাদের অংশ তাঁকে দিলাম। রসূলে করীম (সাঃ) হালিমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন। তাঁকে একটি খাদেম দিলেন এবং খায়বর থেকে প্রাপ্ত নিজের অংশের সম্পদ তাঁকে দান করলেন, যা হযরত ওসমান (রাঃ) এক লাখ দেরহাম দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিনে নেন।

আর এক হক হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে যতদূর সম্ভব আপোষ করে দেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় বলব না, যা নামায রোযা ও দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ অবশ্যই বলুন ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, পরস্পর সন্ধি স্থাপন করা পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করা ধর্মের জন্য মারাত্মক। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

افضل الصدقة اصلاح ذات البين অর্থাৎ, পারস্পরিক সমঝোতা স্থাপন করাই হল সর্বোত্তম সদকা।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– একবার রসূলে করীম (সাঃ) উপবিষ্ট অবস্থায় এত হাসলেন যে, তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ল। তা দেখে হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক– আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের দু'ব্যক্তি রব্বুল ইযযত আল্লাহ তাআলার সম্মুখে নতজানু হয়ে বসল। তাদের একজন আরজ করল, ইয়া রব, আমার হক তার কাছ থেকে দিইয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা অপর ব্যক্তিকে বললেন ঃ তোমার ভাইয়ের হক দিয়ে দাও। সে আরজ করল ঃ ইলাহী, আমার পুণ্য থেকে কিছুই বাকী নেই যা আমি তাকে দেব। আল্লাহ তাআলা বাদীকে বললেন ঃ এখন তুমি কি করবে? তার কাছে তো কোন পুণ্যই অবশিষ্ট নেই। সে আরজ করল ঃ আমার কিছু গোনাহ তাকে দেয়া হোক। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ এটা বড় কঠিন দিন। এদিনে একজনের গোনাহ অন্য জনকে দেয়ারও প্রয়োজন হবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা বাদীকে বললেন ঃ চোখ তুলে জান্নাতের দিকে তাকাও। সে তাকিয়ে বলতে লাগল ঃ ইয়া রব, আমার মনে হয় সেখানে মণিমুক্তা খচিত রৌপ্যের শহর ও স্বর্ণের প্রাসাদ রয়েছে। এটা কোন নবী, সিদ্দীক অথবা শহীদের জন্যে? আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ যে এগুলোর দাম দেবে এগুলো তারই জন্যে। সে আরজ করল ঃ পরওয়ারদেগার, এগুলোর দাম কার কাছে আছে? এরশাদ হল ঃ তোমার কাছে। সে আরজ করল ঃ সেটা কি? আল্লাহ বললেন ঃ মুসলমান ভাইকে ক্ষমা করা। সে আরজ করল ঃ ইলাহী, আমি ক্ষমা করলাম। আল্লাহ বললেন ঃ তা হলে উঠ নিজের ভাইয়ের হাত ধরে তাকে

জান্নাতে দাখিল কর। এর পর রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। পরস্পর সমঝোতা করতে থাক। কেননা, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন মুমিনদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করবেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خيرا اونمى خيرا

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে দুই ব্যক্তির মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে এবং ভাল কথা বলে অথবা সমঝোতার উদ্দেশে কোন ভাল খবর এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়।

এ থেকে জানা যায়, মানুষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করা ওয়াজিব। কেননা, মিথ্যা বর্জন করা ওয়াজিব। কোন ওয়াজিব ততক্ষণ পর্যন্ত তরক করা যায় না, যে পর্যন্ত অধিক জোরদার ওয়াজিব যিম্মায় না চেপে যায়। অতএব দু'ব্যক্তির মধ্যে সমঝোতা স্থাপনকারী যখন মিথ্যাবাদী নয় তখন পারস্পরিক সমঝোতা মিথ্যা বর্জন অপেক্ষা অধিক জোরদার ওয়াজিব হল। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

كل الكذب مكتوب الا ان يكذب الرجل فى الحرب فان الحرب خدعة او يكذب بين الاثنين فيصلح بينهما او يكذب لامراته ليرضيها ـ

অর্থাৎ, প্রত্যেক মিথ্যা লিখিত হয়; কিন্তু তিন প্রকার লিখিত হয় না। প্রথম, যুদ্ধে মিথ্যা বললে। কেননা, যুদ্ধ মানেই চালাকী। দ্বিতীয়, দু'ব্যক্তির মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের উদ্দেশে মিথ্যা বললে এবং তৃতীয় স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মিথ্যা বললে।

সকল মুসলমানের দোষ গোপন করাও একটি হক। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من ستر على مسلم ستره الله تعالى فى الدنيا والاخرة ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে, আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকালে তার দোষ গোপন করবেন।

আরও বলা হয়েছে- যে বান্দা অপরের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ দেখেও গোপন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। সাহাবী মায়েয তাঁর ব্যভিচারের কথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন, তিনি বললেন ঃ তুমি যদি একে কাপড়ের নীচে আবৃত করে নিতে, তবে এটা তোমার জন্যে ভাল হত। এথেকে জানা যায়, নিজের দোষ গোপন রাখাও মুসলমানের জন্যে অপরিহার্য। কেননা, নিজের মুসলমানীর হক তার উপর তেমনি জরুরী, যেমন অন্যের মুসলমানীর হক জরুরী। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন ঃ আমি কোন মদ্যপায়ীকে পাকড়াও করলে আমার কাছে এটাই ভাল মনে হয় যে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন রাখুন। কোন চোরকে পাকড়াও করলেও আমার কাছে তাই ভাল মনে হয়। হযরত ওমর (রাঃ) এক রাতে মদীনায় টহল দানকালে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে যিনা করতে দেখলেন। তিনি সকালে সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ ধরে নাও যদি কোন খলীফা কোন পুরুষ ও নারীকে যিনা করতে দেখে এবং তাদের উপর "হদ" (যিনার শাস্তি) জারি করে, তবে তোমাদের অভিমত কি হবে? তারা বললেন ঃ আপনি খলীফা। আপনার ক্ষমতা আছে। কিন্তু হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বললেন, হদ জারি করা আপনার জন্যে জায়েয নয়। জারি করলে আপনার উপর হদ কায়েম করা হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা যিনার হদ জারির জন্যে অন্ততপক্ষে চার জন সাক্ষীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য অপরিহার্য করেছেন। এর পর হযরত ওমর (রাঃ) কয়েকদিন চুপ থেকে আবার সেই প্রশ্ন তুললেন। সকলে প্রথম অভিমতই ব্যক্ত করলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) তাই বললেন যা প্রথমে বলেছিলেন। এ থেকে জানা যায়, খোদায়ী শাস্তিসমূহের ব্যাপারে খলীফা নিজের জ্ঞান অনুসারে রায় দিতে পারেন কিনা, এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) সন্দিহান ছিলেন। তাই তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরে নেয়ার পর্যায়ে প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন। এ কথা বলেননি যে, আমি এরূপ দেখেছি। কারণ, এটা তার জন্যে নাজায়েয হওয়ার আশংকা ছিল। শরীয়তে দোষ গোপন করাই যে কাম্য, এর জন্যে এ ঘটনাটি একটি বড় প্রমাণ। কেননা, সকল দোষের মধ্যে জঘন্যতম দোষ হচ্ছে যিনা। এর প্রমাণ চার জন সাক্ষীর

উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে, যারা পুরুষাঙ্গকে নারী যৌনাঙ্গের ভিতরে এমনভাবে দেখবে, যেমন সুরমাদানির ভিতরে শলাকা থাকে। চার জন লোকের এভাবে দেখা কখনও হয় না। যদি বিচারক নিজে সত্যি সত্যি এটা জেনেও নেয়, তবুও তা ফাঁস করা তার জন্যে বৈধ নয়। এখন এক দিকে যিনা দমন করা রহস্যের প্রতি লক্ষ্য কর, এর শাস্তি রাখা হয়েছে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এটা নিঃসন্দেহে সর্ববৃহৎ শাস্তি। অপর দিকে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক দোষ গোপন করার নির্দেশের বিষয়টিও চিন্তা কর। তিনি গোনাহগার মানুষের উপর কেমন পুরু পর্দা ফেলে দিয়েছেন। ফলে যিনার অবস্থা ফাঁস হওয়ার পথ সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। আমরা আশা করি, কেয়ামতের দিন এই বিরাট কৃপা থেকে আমরা বঞ্চিত হব না।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দার দোষ দুনিয়াতে গোপন করে, তখন তাঁর কৃপার পক্ষে এটা কিরূপে সম্ভব যে, কেয়ামতে তা ফাঁস করে দেবেন? আর যদি তিনি দুনিয়াতে ফাঁস করে দেন, তবে পরকালে পুনরায় ফাঁস না করার ব্যাপারে অধিক কৃপাশীল। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে মদীনায় টহল দিচ্ছিলাম। আমরা একটি প্রদীপ দেখতে পেয়ে সেদিকে চললাম। কাছে পৌঁছে দেখি একটি রুদ্ধদ্বার গৃহের অভ্যন্তরে লোকজন হৈ চৈ করছে। হযরত ওমর আমার হাত ধরে বললেন ঃ এ গৃহ কার জান? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ এটা রবিয়া ইবনে উমাইয়ার গৃহ। এরা এখন মদ্যপানে মত্ত। তুমি কি বল, এদেরকে গ্রেফতার করব? আমি বললাম ঃ আমরা আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ করেছি। আল্লাহ বলেছেন ঃ ولا تجسسوا অর্থাৎ, গোপন বিষয় তালাশ করে ফিরো না। অতঃপর আমি হযরত ওমরকে তেমনি রেখে চলে এলাম। এ থেকে জানা যায়, দোষ গোপন করা এবং তার পেছনে না পড়া ওয়াজিব। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ যদি তুমি মানুষের দোষের পেছনে পড়, তবে তারা বিগড়ে যাবে অথবা বিগড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- যারা মুখে ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি, তারা শুন, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষের পেছনে পড়ো না। কেননা, যে ব্যক্তি তার মুসলমান

ভাইয়ের দোষের পেছনে পড়ে আল্লাহ তাআলা তার দোষের পেছনে পড়েন। আল্লাহ তা'আলা যার দোষের পেছনে পড়েন, তাকে লাঞ্ছিত করে দেন, যদিও সে নিজের গৃহের অভ্যন্তরে থাকে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমি কোন ব্যক্তিকে খোদায়ী শাস্তি পাওয়ার মত অপরাধে লিপ্ত দেখি, তবে তাকে গ্রেফতার করব না এবং কাউকে ডাকব না যে পর্যন্ত না আমার সাথে অন্য কেউ থাকে। অর্থাৎ, দু'জন সাক্ষী থাকলে অবশ্য সে ব্যক্তি গ্রেফতারের যোগ্য হয়ে যাবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য একজনকে ধরে তাঁর কাছে নিয়ে এসে বলল ঃ এ লোকটি মাতাল। তিনি বললেন ঃ এর ঘ্রাণ লও। ঘ্রাণ লওয়ার পর জানা গেল সে বাস্তবিকই মদ্যপান করেছে। তিনি লোকটিকে মাতলামি দূর হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখলেন। অতঃপর জল্লাদকে বললেন ঃ একে হাত উঁচু করে শরীরের বিভিন্ন অংশে বেত্রাঘাত কর। জল্লাদ আদেশ পালন করল। এর পর যে ব্যক্তি অপরাধীকে নিয়ে এসেছিল, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি অপরাধীর কি হও? সে বলল ঃ আমি তার চাচা। হযরত ইবনে মসঊদ বললেন ঃ তুমি উত্তমরূপে তার শিক্ষাদীক্ষা ও চরিত্র গঠন করনি এবং তার দোষ গোপন করনি। এতদূর পৌঁছে যাওয়ার পর দন্ডবিধান করা শাসকের কর্তব্য হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী । তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন– وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করে।

এর পর হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বললেন ঃ আমার মনে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বপ্রথম কোন্ চোরের হাত কেটেছিলেন। জনৈক চোরকে তাঁর খেদমতে হাযির করা হলে তিনি তার হস্ত কর্তন করলেন। কিন্তু তাঁর মুখমন্ডল মলিন হয়ে গেল। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, মনে হয় আপনি এর হস্ত কর্তন খারাপ মনে করেছেন? তিনি বললেন ঃ খারাপ মনে না করার কি কারণ থাকতে পারে? তোমরা নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। লোকেরা আরজ করল ঃ তা হলে আপনি একে মাফ করে দিলেন না কেন? তিনি বললেন ঃ এতদূর পৌঁছে গেলে দন্ড জারি করা বিচারকের কর্তব্য । আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল । তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ـ

অর্থাৎ, তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এক রেওয়ায়েতে আছে, হস্ত কর্তন করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখমন্ডল এমন বিবর্ণ হল যেন তাতে ছাই পড়ে গেছে। বর্ণিত আছে, ওমর (রাঃ) যখন এক রাতে মদীনায় টহল দিচ্ছিলেন, তখন এক গৃহ থেকে একজন পুরুষের গানের আওয়াজ শুনলেন। তিনি প্রাচীরে আরোহণ করে দেখলেন, পুরুষটির কাছে একজন মহিলা ও মদের পাত্র রক্ষিত রয়েছে। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্র দুশমন, তুই কি মনে করিস আল্লাহ্ তোর দোষ গোপন করবেন, আর তুই তার নাফরমানী করে যাবি? সে আরজ করল ঃ আমিরুল মুমিনীন, আপনি তড়িঘড়ি করবেন না। আমি আল্লাহ্ তা'আলার একটি আদেশ লজ্ঘন করেছি ; কিন্তু আপনি তিনটি বিষয়ে তাঁর নাফরমানী করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَلَا تَجَسَّسُوا (তোমরা দোষ অনুসন্ধান করো না।) অথচ আপনি তাই করছেন। তিনি বলেছেন ঃ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا (ছাদের উপর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা সৎকর্ম নয়।) আপনি প্রাচীর টপকে আমার কাছে এসেছেন । আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ـ

অর্থাৎ, নিজের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশে করো না, যে পর্যন্ত আলাপ পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর; অর্থাৎ, অনুমতি গ্রহণ না কর। আপনি অনুমতি ও সালাম ব্যতিরেকেই আমার গৃহে চলে এসেছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, আমি যদি তোকে ছেড়ে দেই, তবে ভবিষ্যতে ঠিক হয়ে যাবি কিনা? সে বলল ঃ আমিরুল মুমিনীন, আমাকে ক্ষমা করলে আমি জীবনে কখনও এ কাজ করব না। অতঃপর তিনি তাকে তদবস্থায় রেখে ফিরে এলেন।

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যে মানুষের কানে কানে কথা বলবেন– এ সম্পর্কে আপনি রসূল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে কি শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে কাছে ডাকবেন এবং তাহাদের উপর নিজ রহমতের ছায়া বিস্তার করে মানুষের কাছ থেকে তাদেরকে গোপন করে নেবেন। এর পর বলবেন ঃ তোমার অমুক গোনাহ মনে আছে কি? বান্দা আরজ করবে, ইয়া রব, মনে আছে। এভাবে যখন আল্লাহ বান্দার কাছ থেকে তার সকল গোনাহের স্বীকারোক্তি নিয়ে নেবেন এবং বান্দা নিজেকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য করবে, তখন এরশাদ করবেন ঃ হে আমার বান্দা, আমি দুনিয়াতে তোমার দোষ গোপন করেছিলাম, যাতে আজ তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারি। এর পর বান্দার হাতে তার পুণ্যের তালিকা দেয়া হবে। কাফের ও মোনাফেকদের অবস্থা হবে, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরা বলবে– এরাই নিজের পালনকর্তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, জালেমদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।

এক হাদীসে আছে– كل امتى معا فى الا المجاهرون

অর্থাৎ, আমার সকল উম্মত ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে; কিন্তু প্রকাশ্যে গোনাহকারীরা হবে না। সে ব্যক্তিও প্রকাশ্যে গোনাহকারী গণ্য হবে, যে গোপনে গোনাহ করার পর মানুষকে তা জানিয়ে দেয়। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

من استمع ستر قوم وهم له كارهون صب فى اذنيه الانك يوم القيامة -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গোপন ভেদ শুনে এবং তারা সেটা অপছন্দ করে, কেয়ামতের দিন তার কানে রাঙ্গতা গালিয়ে ঢেলে দেয়া হবে। আর একটি হক হল, অপবাদের জায়গা থেকে দূরে থাকতে হবে, যাতে মুসলমানদের মন তোমার প্রতি কুধারণা থেকে এবং তাদের জিহ্বা তোমার গীবত থেকে বেঁচে থাকে। কেননা, তারা তোমাকে মন্দ বলে যদি আল্লাহর নাফরমানী করে এবং এ নাফরমানীর কারণ তুমিই হও তবে তুমিও এতে অংশীদার হবে। সেমতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ -

অর্থাৎ, কাফেররা যে সকল প্রতিমার পূজা করে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। তা হলে কাফেররা না বুঝে ধৃষ্টতা সহকারে আল্লাহকে গাল মন্দ করবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে গালি দেয়, তোমাদের মতে সে কেমন? লোকেরা আরজ করল ঃ কোন ব্যক্তি কি তার পিতামাতাকে গালি দেয়? এটা কি সম্ভব? তিনি বললেন ঃ হাঁ, গালি দেয়, তা এভাবে যে, সে অন্যের পিতামাতাকে গালি দেয়, জওয়াবে সে তার পিতামাতাকে গালি দেয়। ফলে সে যেন নিজেই নিজের পিতামাতাকে গালি দিল।

সারকথা, গোনাহের কারণ হওয়া নিজে গোনাহ করার মতই। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার তাঁর কোন পত্নীর সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে চলে গেল। তিনি লোকটিকে ডাকিয়ে এনে বললেন ঃ সে আমার স্ত্রী সফিয়্যা। লোকটি আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি অন্যের বেলায় ধারণা করলেও আপনারা বেলায় ধারণা করতাম না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনন ঃ শয়তান মানুষের মধ্যে তার রক্তের জায়গা দিয়ে চলে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফে ছিলেন। দু'ব্যক্তি সেখান দিয়ে গেলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ জেনে রাখ, সে আমার স্ত্রী সফিয়্যা। আমার আশংকা হল, শয়তান না তোমাদের অন্তরে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে অপবাদের জায়গায় দাঁড় করায়, এর পর তার প্রতি কেউ কুধারণা করে, সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে তিরস্কার না করে। কেননা, সে এরূপ না করেলে কেউ তার প্রতি কুধারণা করত না। হযরত ওমর এক ব্যক্তিকে পথিমধ্যে কোন এক মহিলার সাথে কথা বলতে দেখে তাকে দোররা মারতে লাগলেন। লোকটি আরজ করল ঃ আমিরুল মুমিনীন, সে আমার স্ত্রী । তিনি বললেন ঃ তা হলে এমন জায়গায় কথা বললে না কেন, যেখানে কেউ তোমাকে দেখবে না?

আর একটি হক হচ্ছে, কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে যদি তোমার কদর মর্যাদা থাকে, তবে কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে প্রয়োজন হলে তার কাছে সুপারিশ করবে। এতে তুমিও সওয়াব পাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বলেন ঃ মানুষ আমার কাছে এসে তাদের বিভিন্ন অভাব-অনটন ব্যক্ত করে। তোমরা আমার কাছেই থাক। অতএব সুপারিশ কর; সওয়াব পাবে। আল্লাহ্ তাঁর নবীর হাতে নিজের পছন্দ অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন। হযরত মোয়াবিয়ার রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার সামনে সুপারিশ কর, যাতে সওয়াব পাও। এক হাদীসে আছে– মুখের সদকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সদকা নেই। কেউ প্রশ্ন করল, মুখের সদকা কিভাবে হয়? তিনি বললেন ঃ সুপারিশ দ্বারা। এর কারণে রক্ত সংরক্ষিত হয়, অপরের উপকার হয় এবং তার উপর থেকে বিপদ কেটে যায়। হযরত ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, বরীরার স্বামী ছিল মুগীস নামক জনৈক গোলাম। মুগীসের চেহারা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। সে বরীরার পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। অশ্রুতে তার দাড়ি ভিজে যাচ্ছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, মুগীস বরীরাকে এত ভালবাসে; অথচ বরীরা তাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। অতঃপর তিনি বরীরাকে বললেন ঃ চমৎকার হত যদি তুমি তার কাছে ফিরে যেতে। সে-তো তোমার সন্তানের পিতা। বরীরা আরজ করল ঃ যদি আপনি আদেশ করেন, তবে আমি তাই করব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমি আদেশ করি না; বরং সুপারিশ করি। সালাম করা এবং মোসাফাহা করাও একটি হক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালামের পূর্বে কথা শুরু করে, তার কথার জওয়াব দিয়ো না যে পর্যন্ত না সে সালাম করে। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ আমি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে সালাম না করেই অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি এরশাদ করলেন ঃ সরে যাও এবং বল– আসসালামু আলাইকুম, আমার ভিতরে আসার অনুমতি আছে কি? হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা যখন নিজের ঘরে যাও, তখন ঘরের লোকদেরকে সালাম কর। কেননা, যে এরূপ করে, তার ঘরে শয়তান আসে না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি আট বছর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমাকে বললেন, হে আনাস, ওযু পূর্ণ কর। এতে

তোমার আয়ু বৃদ্ধি পাবে। আমার উম্মতের মধ্যে যার সাথে দেখা হয় তাকে সালাম কর। এতে তোমার পুণ্য বৃদ্ধি পাবে। যখন তুমি নিজ গৃহে প্রবশ কর, তখন গৃহের লোকদের সালাম কর। এতে তোমার গৃহে বরকত বুদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ـ

অর্থাৎ, যখন তোমাদেরকে সালাম করা হয়, তখন তোমরা তদপেক্ষা উত্তম সালাম কর অথবা উল্টে তাই বল। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ

والذى نفسى بيده لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فلا ادلكم على عمل اذا عملتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال افشوا السلام بينكم ـ

অর্থাৎ, সে আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা জান্নাতে দাখিল হবে না যে পর্যন্ত মুমিন না হবে এবং তোমরা মুমিন হবে না যে পর্যন্ত একে অপরকে মহব্বত না করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন আমল বলে দেব না, যা পালন করলে তোমরা একে অপরকে মহব্বত করবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ বলে দিন ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের খুব চর্চা কর।

আরও বলা হয়েছে– যখন মুসলমান অপরকে সালাম করে, তখন ফেরেশতা তার প্রতি সত্তর বার রহমত প্রেরণ করে। আরও বলা হয়েছে, যখন মুসলমান অপর মুসলমানের কাছ দিয়ে চলে যায় এবং সালাম করে না, তখন ফেরেশতারা বিস্মিত হয়। আরও বলা হয়েছে–

يسلم الراكب على الماشى واذا سلم من القوم واحد اجزأ عنهم ـ

অর্থাৎ সওয়ার ব্যক্তি যে পায়ে হাঁটে তাকে সালাম করবে। অনেক লোকের মধ্য থেকে একজন সালাম করলে সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত কাতাদা থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী লোকদের জন্যে সাক্ষাতের উপঢৌকন ছিল সেজদা। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে সালাম দান করেছেন, যা জান্নাতীদের উপঢৌকন। আবু মুসলিম খাওলানী

(রহঃ) লোকজনের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম করতেন না। তিনি বলতেন ঃ সালাম না করার কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, আমি আশংকা করি, লোকজন আমার সালামের জওয়াব দেবে না। ফলে ফেরেশতারা তাদের প্রতি লানত করবে। সালামের সাথে মুসাফাহা করাও সুন্নত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলল ঃ "আসসালামু আলাইকুম"। তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তির জন্যে দশটি পুণ্য। এর পর অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।' তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি বিশটি পুণ্য পাবে। এর পর আর এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।" তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি পাবে ত্রিশটি নেকী। হযরত আনাস (রাঃ) শিশুদের কাছ দিয়ে গেলে তাদেরকে সালাম করতেন এবং বলতেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) এরূপ করেছেন। আবদুল হামিদ ইবনে বাহরাম (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন মসজিদে তশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে একদল মহিলা বসে ছিল। তিনি হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম করলেন। বর্ণনাকারী আবদুল হামিদও হাদীসটি বর্ণনা করার সময় হাতে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم فى الطريق فاضطروهم الى اضيقه ـ

অর্থাৎ, ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে প্রথমে সালাম করো না। রাস্তায় তাদের সাথে দেখা হলে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য কর। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لاتصافحوا اهل الذمة ولا ابتدأوهم بالسلام فاذا لقيتموهم فى الطريق فاضطروهم الى اضيقه ـ

অর্থাৎ, যিম্মীদের সাথে মোসাফাহা করো না এবং তাদেরকে প্রথমে সালাম করো না। রাস্তায় তাদের সাথে দেখা হলে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে চলতে বাধ্য কর।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একদল ইহুদী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল ঃ 'আসসামু আলাইকা' (আপনি নিপাত যান)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ "আলাইকুম" (তোমরা)। হযরত আয়েশা বলেন ঃ আমি বললাম, "বাল আলাইকুম ওয়াল্লানাতু" (বরং তোরা নিপাত যা এবং তোদের প্রতি লানত)। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা, আল্লাহ তা'আলা নম্রতা পছন্দ করেন। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ঃ আপনি শুনেননি এরা কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ আমিও তো "আলাইকুম" বলে দিয়েছি। এক হাদীসে আছে–

يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير ـ

অর্থাৎ, সওয়ার ব্যক্তি যে পায়ে হাঁটে তাকে সালাম করবে। যে পায়ে হাঁটে সে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম করবে। অল্পসংখ্যক লোক বেশী সংখ্যককে এবং ছোট বড়কে সালাম করবে। আরও বলা হয়েছে– তোমাদের কেউ কোন মজলিসে এলে সালাম করা উচিত। ইচ্ছা হলে মজলিসে বসবে। এর পর দাঁড়ালে সালাম করবে। কেননা, প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালামের তুলনায় অধিক আইনসিদ্ধ নয়।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন দুই ঈমানদার পরস্পর মিলিত হয় এবং মোসাফাহা করে, তখন তাদের মধ্যে সত্তরটি রহমত বন্টন করা হয়। তাদের মধ্যে যে অধিক হাসিমুখ, সে ঊনসত্তরটি পায়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয়, তখন তাদের মধ্যে একশ'টি রহমত বন্টন করা হয়। যে প্রথমে সালাম করে, তার ভাগে পড়ে নব্বইটি এবং অপর ব্যক্তি পায় দশটি। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ মোসাফাহা বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করে। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের পারস্পরিক সালামের পরিশিষ্ট হচ্ছে মোসাফাহা। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– মুসলমানকে চুম্বন করা নিজ ভাইয়ের সাথে মোসাফাহার শামিল। বরকত হাসিল করা ও সম্মান করার উদ্দেশে বুযুর্গ ব্যক্তির হাত চুম্বন করায় কোন দোষ নেই। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র হস্ত চুম্বন করেছি। কা'ব ইবনে মালেক বলেন ঃ যখন আমার তওবা

সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়, তখন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে তাঁর হস্ত চুম্বন করি। একবার জনৈক বেদুঈন আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাকে আপনার মস্তক ও হস্ত চুম্বন করার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলেন এবং বেদুঈন তাঁর মস্তক ও হস্ত চুম্বন করল। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সাথে মোসাফাহা করেন, হস্ত চুম্বন করেন, অতঃপর উভয়েই সজোরে ক্রন্দন করতে থাকেন। হযরত বারা ইবনে আযেব বর্ণনা করেন, একবার রসূলে করীম (সাঃ) ওযু করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি জওয়াব দিলেন না। এর পর ওযু শেষ করে সালামের জওয়াব দিলেন এবং হাত বাড়িয়ে মোসাফাহা করলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি জানতাম মোসাফাহা করা অনারবদের অভ্যাস। তিনি বলেন ঃ দুই মুসলমান যখন মিলিত হয় এবং মোসাফাহা করে, তখন উভয়ের গোনাহ ঝরে পড়ে। এক হাদীসে আছে, যখন কোন ব্যক্তি লোকজনের কাছ দিয়ে যায় এবং তাদেরকে সালাম করে, যদি তারা তার সালামের জওয়াব দেয়, তবে তার মর্যাদা লোকজনের উপর এক স্তর উন্নত হবে। কারণ সে তাদেরকে সালাম মনে করিয়ে দিয়েছে। আর যদি তারা সালামের জওয়াব না দেয়, তবে তাদের চেয়ে উত্তম একটি দল অর্থাৎ, ফেরেশতারা তার সালামের জওয়াব দেবে। সালাম করার সময় মাথা নত করা নিষেধ। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম, আমাদের একজন অন্য জনের সামনে নত হবে কি না? তিনি বললেন ঃ না। আমরা বললাম ঃ একজন অন্যজনকে চুম্বন করবে কি না? তিনি বললেন, হাঁ। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে যখনই সাক্ষাৎ করেছি, তখনই তিনি মোসাফাহা করেছেন। একদিন তিনি আমাকে তালাশ করলেন। আমি ঘরে ছিলাম না। যখন জানলাম, তখন তিনি তখতের উপর ছিলেন। তদবস্থায় তিনি আমার সাথে মোআনাকা (কোলাকুলি) করলেন। এ থেকে জানা গেল, কোলাকুলি করা ভাল। আলেমগণের সম্মানার্থে তাদের সওয়ারীর পাদান ধরে রাখার কথা হাদীসে

বর্ণিত আছে। সেমতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)-এর পাদান ধরেছিলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পাদান ধারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়েদ ইবনে সাবেত ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে তাই কর। কারও সম্মানার্থে দন্ডায়মান হওয়া মাকরূহ নয়, যদি সেই ব্যক্তি তেমনটি আশা না করে। যদি সে নিজে চায় যে, মানুষ দাঁড়িয়ে তার সম্মান করুক, তবে দাঁড়ানো মাকরূহ। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় অন্য কেউ ছিল না। কিন্তু আমাদের নিয়ম ছিল, তাঁকে দেখে আমরা দাঁড়াতাম না। কারণ, আমরা জানতাম তিনি এটা পছন্দ করেন না। তিনি একবার বললেন ঃ তোমরা আমাকে দেখে দাঁড়িয়ো না; যেমন অনারবরা দাঁড়ায়। তিনি আরও বলেন ঃ

من سره يمثل الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ـ

অর্থাৎ, লোকজনের দাঁড়িয়ে থাকা যার জন্যে আনন্দদায়ক হয়, তার ঠিকানা জাহান্নাম। আরও বলা হয়েছে ঃ

لايقوم الرجل لرجل عن مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا اوتفسحوا ـ

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্যে দাঁড়িয়ে আবার বসবে না; কিন্তু তোমরা মজলিসে স্থান সংকুলান করবে।

এ নিষেধাজ্ঞার কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ থেকে বেঁচে থাকতেন। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রস্রাব করার সময় সালাম করলে তিনি জওয়াব দানে বিরত থাকেন। এ থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি প্রস্রাব পায়খানায় ব্যস্ত থাকে, তাকে সালাম করা মাকরূহ। শুরুতে আলাইকুমুস সালাম বলে সালাম করাও মাকরূহ। এক ব্যক্তি এ শব্দ প্রয়োগে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাম করলে তিনি বললেন ঃ এটা মৃতের উপঢৌকন। তিনি একথাটি তিন বার বলে অবশেষে বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাথে দেখা করলে বলবে– "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"। যে ব্যক্তি কোন মজলিসে এসে সালাম করে,

অতঃপর বসার জায়গা পায় না, তার সেখান থেকে ফিরে যাওয়া উচিত নয়; বরং সে কাতারের পেছনে বসে যাবে। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে বসা ছিলেন, এমন সময় তিন ব্যক্তি আগমন করল। তাদের দু'জন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে এগিয়ে গেল। একজন সামান্য জায়গা পেয়ে বসে পড়ল এবং দ্বিতীয় জন লোকজনের পেছনে বসে গেল। তৃতীয় ব্যক্তি স্থান না দেখে ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের কাজ শেষে বললেন ঃ এই তিন জন লোকের অবস্থা আমি বর্ণনা করছি শুন। একজন তো আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করেছে। আল্লাহ তাকে স্থান দিয়েছেন। দ্বিতীয়জন 'হায়া' তথা লজ্জা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ তার ব্যাপারে হায়া করেছেন। তৃতীয়জন পৃষ্ঠ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে আল্লাহ তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যে দু'জন মুসলমান পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং মোসাফাহা করে, পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের গোনাহসমূহ মার্জনা করা হয়।

আর একটি হক হল, সক্ষম হলে মুসলমান তার মুসলমান ভাইয়ের ইযযত, জান ও মাল জালেমের কবল থেকে রক্ষা করবে, জালেমকে প্রতিহত করবে এবং মজলুমের সাহায্য করে তার পক্ষ থেকে জালেমের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবীস্বরূপ এটা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে অপর ব্যক্তিকে মন্দ বললে তৃতীয় ব্যক্তি তার পক্ষ হয়ে তাকে বাধা দিল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من النار -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভাইয়ের ইযযত রক্ষা করে, তার এ কর্ম তার জন্যে দোযখ থেকে আড়াল হয়ে যাবে।

আরও বলা হয়েছে– যে মুসলমান তার ভাইয়ের ইযযত বাঁচায়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে অবশ্যই দোযখের আগুন থেকে বাঁচাবেন। হযরত আনাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যার সামনে তার মুসলমান ভাইয়ের কুৎসা রটনা করা হয় এবং ক্ষমতা

থাকা সত্ত্বেও সে তা প্রতিহত করে না, ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন। পক্ষান্তরে এমতাবস্থায় যে তার মুসলমান ভাইকে সাহায্য করবে, ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। হযরত জাবের ও তালহা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে মুসলমান অপর মুসলমানের সাহায্য এমন জায়গায় করে না, যেখানে তার ইযযত ও সম্মান বিনষ্ট হতে থাকে, আল্লাহ তা'আলা এমন স্থানে তার সাহায্য করবেন না, যেখানে তার অন্তর সাহায্য প্রত্যাশা করবে।

হাঁচির জওয়াব দেয়াও একটি হক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে হাঁচি দেয়, সে বলবে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (সর্বাবস্থায় প্রশংসা আল্লাহর)। আর যে জওয়াব দেবে, সে বলবে– يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন)। যে হাঁচি দেয় সে পুনরায় বলবে– يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত করুন এবং তোমার অবস্থা সংশোধন করুন)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক ব্যক্তির হাঁচির জওয়াব দিলেন এবং অন্য এক ব্যক্তির জওয়াব দিলেন না। লোকটি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করেছে; কিন্তু তুমি নিশ্চুপ রয়েছ। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মুসলমানকে তিন বার হাঁচির জওয়াব দেবে। এর বেশী হাঁচি দিলে সেটা সর্দি। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) নীচ স্বরে হাঁচি দিতেন এবং নাক কাপড় কিংবা হাতে আবৃত করে নিতেন। হযরত আবু মূসা আশআরী বলেন ঃ ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে হাঁচি দিত এই আশায় যে, তিনি ইয়ারহামুকাল্লাহ বলুন; কিন্তু তিনি ইয়াহদীকুমুল্লাহ বলতেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فاذا تثاؤب احدكم فليضع يده على فيه فاذا قال اه اه فان الشيطن يضحك من خوفه -

অর্থাৎ হাঁচি হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আর হাই শয়তানের পক্ষ থেকে। যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন মুখের উপর হাত রাখবে। সে যখন আহ, আহ, করে, তখন শয়তান তার ভয়ে হাস্য করে।

হযরত ইবরাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ এস্তেঞ্জার অবস্থায় হাঁচি এলে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করায় কোন দোষ নেই। হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ এমতাবস্থায় মনে মনে আলহামদু লিল্লাহ বলে নেবে। কা'ব আহবার হযরত মূসা (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজ করলেন, ইলাহী, তুমি নিকটে হলে আমি নিঃশব্দে তোমাকে কিছু বলব আর দূরবর্তী হলে সশব্দে বলব। আল্লাহ এরশাদ করলেন ঃ যে কেউ আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সঙ্গে থাকি। মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ আমরা কোন সময় এমন অবস্থায় থাকি, যাতে তোমাকে স্মরণ করা যায় না, যেমন নাপাকী বা প্রস্রাব-পায়খানার অবস্থা। আল্লাহ্ বললেন ঃ সর্বাবস্থায় আমাকে স্মরণ কর।

আর একটি হক হল, দুষ্ট লোকের সাথে পালা পড়লে সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা কোন কোন মানুষের সামনে হাসি; কিন্তু অন্তর তাদেরকে অভিসম্পাত করে। বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা প্রদর্শনের অর্থ এটাই। এটা তাদের সাথে করা হয়, যাদের তরফ থেকে অনিষ্টের আশংকা থাকে ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ (তারা ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে)। وَيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ سيئة তথা মন্দ বলে অশ্লীলতা এবং حسنة বলে সালাম ও সৌজন্য বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ তাকে আসতে দাও। সে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে জঘন্যতম ব্যক্তি। এর পর লোকটি ভেতরে এলে তিনি তার সাথে অত্যন্ত নম্র কথাবার্তা বললেন। এতে আমার

ধারণা হল, তাঁর কাছে লোকটির ইজ্জত রয়েছে। লোকটি চলে গেলে আমি আরজ করলাম ঃ যখন সে আসতে চেয়েছিল, তখন তো আপনি এমন এমন মন্তব্য করলেন, এর পর তার সাথে এমন নম্র কথা বললেন; এর রহস্য কি? তিনি বললেন ঃ আয়েশা, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক হীন মর্যাদাসম্পন্ন সে ব্যক্তি হবে, যার কটূক্তির কারণে মানুষ তার সঙ্গ ত্যাগ করে । এক হাদীসে আছে– যে বিষয়ের মাধ্যমে মানুষ তার ইজ্জত বাঁচায়, তা হল তার জন্যে সদকা। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, মানুষের সাথে মেলামেশা তাদের কর্ম অনুযায়ী কর এবং অন্তর দিয়ে তাদের থেকে আলাদা থাক। মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন উপায় বের করা পর্যন্ত যাদের সংসর্গে না থেকে উপায় নেই, তাদের সাথে যে ব্যক্তি সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করে না, সে বুদ্ধিমান নয়।

ধনীদের সাথে উঠাবসা থেকে বিরত থাকা, দরিদ্রদের সাথে মেলামেশা করা এবং এতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করাও একটি হক। রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ ـ

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্, আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ, মিসকীনরূপে মৃত্যুদান কর এবং মিসকীনদের দলে আমার হাশর কর।'

হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর রাজত্বকালে যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং কোন দরিদ্র লোককে দেখতেন, তখন তার কাছে গিয়ে বসতেন এবং বলতেন ঃ এক মিসকীন অন্য এক মিসকীনের সাথে একত্রে বসেছে। কথিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'হে মিসকীন' বলে কেউ ডাকলে এটা তাঁর কাছে অন্য যে কোন সম্বোধনের তুলনায় অধিকতর প্রিয় ছিল। কা'ব আহ্বার (রঃ) বর্ণনা করেন, কোরআনের যেস্থানে 'হে ঈমানদারগণ' বলা হয়েছে, তাওরাতে সেখানে 'হে মিসকীনগণ' বলা হয়েছে। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন ঃ দোযখের সাতটি

দরজা রয়েছে– তিনটি ধনীদের জন্যে, তিনটি নারীদের জন্যে এবং একটি দরিদ্র ও মিসকীনদের জন্যে। হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ আমি শুনেছি কোন একজন নবী আল্লাহ্‌র দরবারে আরজ করলেন, ইলাহী, আমি কিভাবে জানব যে, তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট? এরশাদ হল, লক্ষ্য করবে দরিদ্ররা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট কি না? এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, নিজেকে মৃতদের সাথে উঠাবসা থেকে বাঁচাও। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌, মৃত কারা? উত্তর হল ঃ ধনাঢ্যরা। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, ইলাহী আমি তোমাকে কোথায় খুঁজব? উত্তর হল ঃ ভগ্নহৃদয়দের কাছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ পাপাচারীর ধনৈশ্বর্য দেখে ঈর্ষা করো না। কারণ, তুমি জান না, মৃত্যুর পর তার কি অবস্থা হবে। তার পেছনে তো একজন তাড়াহুড়াকারী গ্রহীতা (মৃত্যু) লেগে আছে। এতীমের সেবাযত্নের ফযীলত নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন এতীমকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রাখে, যার পিতা-মাতা মুসলমান ছিল, তার জন্যে জান্নাত নিশ্চিতরূপে ওয়াজিব। তিনি আরও বলেন–

انا وكافل اليتيم كهاتين ويشير باصبعيه .

অর্থাৎ, আমি এবং এতীমদের ভরণপোষণকারী এ দুটির মত। একথা বলার সময় তিনি দু'অঙ্গুলির দিকে ইশারা করছিলেন। আরও বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি এতীমের মাথায় অনুগ্রহের হাত বুলাবে, যতগুলো চুলের উপর দিয়ে তার হাত যাবে, ততগুলো নেকী সে পাবে। আরও বলা হয়েছে– মুসলমানদের গৃহসমূহের মধ্যে সেই গৃহ উত্তম, যাতে এতীম থাকে এবং তার সাথে সদাচরণ করা হয়। পক্ষান্তরে সেই গৃহ সর্বনিকৃষ্ট, যাতে এতীম থাকে; কিন্তু তার সাথে অসদাচরণ করা হয়।

প্রত্যেক মুসলমানের মঙ্গল কামনা করা এবং তাকে প্রফুল্ল করার প্রয়াস পাওয়াও একটি হক। নবী করীম (সাঃ) বলেন–

لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ মুমিন হবে না যে পর্যন্ত নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, তার মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তাই পছন্দ না করে। আরও বলা হয়েছে–

ان احدكم مرأة اخيه فاذا راى فيه شيئا فليمطه عنه .

অর্থাৎ. তোমাদের একজন অপর জনের আয়না। যখন তার মধ্যে কোন কিছু দেখে, তখন তা দূর করে দেয়া উচিত। অন্য এক হাদীসে আছে– যে কোন ঈমানদারকে শান্তি দেয়, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তাকে শান্তি দেবেন। আরও বলা হয়েছে, রাতে কিংবা দিনে এক ঘন্টা নিজের ভাইয়ের কাজে ব্যয় করবে– কাজ পূর্ণ হোক বা না হোক, এটা তার জন্যে দু'মাস এ'তেকাফ করার চেয়ে উত্তম হবে। এক হাদীসে আছে–

انصر اخاك ظالما او مظلوما فقيل كيف ننصره ظالما قال تمنعه من الظلم .

অর্থাৎ, তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালেম হোক কিংবা মজলুম। প্রশ্ন করা হল ঃ আমরা জালেমকে কেমন করে সাহায্য করব? তিনি বললেন ঃ তাকে জুলুম করতে নিষেধ করবে। আরও বলা হয়েছে– ঈমানদারকে প্রফুল্ল করা, তার কোন দুঃখ দূর করা, ঋণ আদায় করা এবং ক্ষুধার্ত হলে অন্নদান করা আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আরও বলা হয়েছে– দু'টো অভ্যাস সবচেয়ে মন্দ– আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং আল্লাহর বান্দাদের ক্ষতি করা। পক্ষান্তরে দু'টি অভ্যাসের চেয়ে বড় কোন পুণ্য কাজ নেই– আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তার বান্দাদের উপকার করা। রুগ্ন ব্যক্তিকে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করাও একটি হক। এ হকের জন্যে রোগীর পরিচিত হওয়া এবং মুসলমান হওয়া যথেষ্ট। এর নিয়ম হল, রোগীর কাছে কিছুক্ষণ বসবে, প্রশ্ন কম করবে, সমবেদনা প্রকাশ করবে এবং আরোগ্য লাভের জন্যে দোয়া করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করার পূর্ণতা হচ্ছে, তার কপালে অথবা হাতের উপর নিজের হাত রেখে জিজ্ঞেস করবে, কেমন

আছেন? যে ব্যক্তি রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করে, সে যেন জান্নাতের খর্জুর বাগানে উপবেশন করে। সে যখন উঠে, তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা রাত পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দোয়া করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ বান্দা অসুস্থ হলে আল্লাহ তা'আলা তার কাছে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করে বলেন ঃ দেখ সে তার অবস্থা জিজ্ঞাসাকারীদের কাছে কি বলে। যদি অবস্থা জিজ্ঞাসাকারীদের আগমনে রোগী আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে তবে ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে আরজ করে, অথচ আল্লাহ তাআলা নিজেই জানেন। এর পর আল্লাহ বলেন ঃ যদি আমি এই বান্দাকে ওফাত দেই, তবে তাকে জান্নাতে দাখিল করা, যদি আরোগ্য দেই, তবে তার গোশতের চেয়ে ভাল গোশত দেয়া, রক্তের চেয়ে ভাল রক্ত দেয়া এবং তার গোনাহ মাফ করা আমার জন্য অপরিহার্য, এগুলো আমি করবই। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা যার মঙ্গল চান তাকে বিপদাপদে জড়িত করেন, যাতে সে গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করা একবার সুন্নত এবং অধিক বার নফল। শিষ্টাচার হচ্ছে উত্তম সবর করা, অভিযোগ ও অস্থিরতা কম করা, দোয়া প্রার্থনা করা এবং ওষুধের সাথে ওষুধ স্রষ্টার উপর ভরসা করা।

মুসলমানের জানাযার সাথে চলাও একটি হক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে জানাযার পেছনে চলে সে এক কীরাত সওয়াব পায়। সহীহ হাদীসে আছে, কীরাত ওহুদ পাহাড়ের সমান। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এ হাদীসটি শুনে বললেন ঃ আমি এ পর্যন্ত অনেক কীরাত আখেরাতের জন্যে সঞ্চয় করেছি। জানাযার পেছনে চলার উদ্দেশ্য, মুসলমানের হক আদায় করা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা। মকহুল দামেশকী জানাযা দেখে বলতেন– আমরাও আসছি। এটা উপদেশ– কিন্তু এখন গাফিলতি চরমে পৌঁছেছে। পূর্ববর্তীরা চলে যায় কিন্তু পরবর্তীরা বুঝে না। ইবরাহীম যাইয়াত লোকজনকে মৃতের জন্যে রহমতের দোয়া করতে দেখে বলতেন ঃ তোমরা নিজেদের জন্যে রহমতের দোয়া করলে তা উত্তম হত। কেননা, এই মৃত ব্যক্তি তো তিনটি মনযিল থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। অর্থাৎ,

মালাকুল মওতের আকৃতি দেখে নিয়েছে, মৃত্যুর তিক্ততা আস্বাদন করেছে এবং খাতেমার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তোমাদের এসব মনযিল সামনে রয়ে গেছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

يتبع الميت ثلثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله ـ

অর্থাৎ, মৃতের পেছনে তিনটি বস্তু চলে। অতঃপর দু'টি ফিরে আসে এবং একটি বাকী থাকে। অর্থাৎ, তার পরিবারের লোকজন, অর্থ সম্পদ ও তার আমল পেছনে চলে। এর পর পরিবারের লোকজন ও অর্থসম্পদ ফিরে আসে এবং আমল তার সঙ্গে থেকে যায়।

মুসলমানের কবর যিয়ারত করাও একটি হক। এর উদ্দেশ্য দোয়া, শিক্ষা এবং অন্তরকে নরম করা। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বের হলাম। তিনি কবরস্থানে পৌঁছে একটি কবরের কাছে বসে গেলেন। আমি অন্যদের তুলনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অধিক নিকটে ছিলাম। তিনি কাঁদলেন এবং আমিও কাঁদলাম। তিনি শুধালেন, তুমি কাঁদলে কেন? আমি আরজ করলাম ঃ আপনার কান্নার কারণে। তিনি বললেন ঃ এটা আমার জননী আমেনা বিনতে ওয়াহাবের কবর। আমি পরওয়ারদেগারের কাছে যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। এর পর আমি তাঁর জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করার আবেদন করলে তা মঞ্জুর হল না। তাই আমি কেঁদেছি, যা সন্তানের জন্যে স্বাভাবিক। হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কবরে দাঁড়াতেন, তখন এত কাঁদতেন যে, অশ্রুতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তিনি বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

ان القبر اول منازل الاخرة فان نجا منه صاحبه فما بعده ايسر وان لم ينج منه فما بعده اشد ـ

অর্থাৎ কবর হল আখেরাতের প্রথম মনযিল। যদি কবরবাসী এখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তবে পরবর্তী মনযিলসমূহ সহজ। আর যদি এখানে

মুক্তি না পায়, তবে পরবর্তী মনযিলসমূহ আরও কঠিন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কবর মৃতের সাথে প্রথমে বলে, আমি সাপ-বিচ্ছুর ঘর, নির্জন গৃহ, মুসাফিরখানা, অন্ধকার মনযিল। এসব বস্তু আমি তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি। তুমি আমার জন্যে কি উপকরণ সংগ্রহ করেছ? হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ শুন, আমি তোমাদেরকে আমার নিঃস্বতার দিনের কথা বলছি। এটা সে দিন, যে দিন আমাকে কবরে রাখা হবে। আবুদ্দারদা (রাঃ) প্রায়ই কবরের কাছে বসে থাকতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ আমি এমন লোকদের কাছে বসি, যারা আমাকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের কাছ থেকে চলে গেলে তারা আমার গীবত করে না। হাতেম আসাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরস্থান হয়ে গমন করে, অতঃপর নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং কবরবাসীদের জন্যেও দোয়া করে না, সে নিজের সাথে এবং কবরবাসীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এক হাদীসে আছে– প্রত্যেক রাত্তে একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা করে, হে কবরবাসীরা, তোমরা কার উপর ঈর্ষা কর? তারা বলে, আমরা মসজিদের বাসিন্দাদের উপর ঈর্ষা করি। কারণ, তারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং আল্লাহর যিকির করে। আমরা তা করতে পারি না। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরকে অধিক স্মরণ রাখবে, সে কবরকে জান্নাতের একটি বাগানরূপে পাবে। আর যে কবরের স্মরণ থেকে গাফেল থাকবে, সে তাকে দোযখের একটি গর্তরূপে পাবে। রবী ইবনে খায়সাম নিজের গৃহে একটি কবর খুদে রেখেছিলেন। অন্তরে কঠোরতা অনুভব করলেই তিনি তাতে শুয়ে পড়তেন। ঘন্টাখানেক শোয়ার পর এই আয়াত পাঠ করতেন ঃ رَبِّ ارْجِعُوْنَ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার, আমাকে ফিরিয়ে দাও, যাতে আমি পেছনে ফেলে আসা কর্মসমূহের মধ্যে কোন সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারি। এর পর বলতেন ঃ হে রবী, তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন সৎকর্ম করে নাও সে দিনের আগে, যখন আর ফিরিয়ে দেয়া হবে

না। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন ঃ আমি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের সাথে কবরস্থানে গেলাম। তিনি কবর দেখেই কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, মায়মুন, এগুলো আমার পিতৃপুরুষ বনী উমাইয়ার কবর। দেখে মনে হয়, তারা যেন দুনিয়াবাসীদের আনন্দ উৎসবে কখনও শরীক ছিল না। দেখ, এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। রয়ে গেছে কেবল কিসসা-কাহিনী। সাপ বিচ্ছুতে তাদের দেহ খেয়ে ফেলেছে। এর পর তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি বিলাস-ব্যসনে মত্ত এবং আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভীক তাদের চেয়ে বেশী কাউকে জানি না।

প্রতিবেশীর হক ঃ প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের যে সকল হক বর্ণিত রয়েছে, প্রতিবেশীর হক সেগুলো থেকে আলাদা। তাই প্রতিবেশী মুসলমান হলে তার হক অন্য মুসলমানের তুলনায় বেশী হবে। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ প্রতিবেশী তিন প্রকার, প্রথম যার হক একটি; দ্বিতীয়, যার হক দুটি এবং তৃতীয়, যার হক তিনটি। যার হক তিনটি, সে হচ্ছে মুসলমান, আত্মীয় প্রতিবেশী। যার হক দু'টি সে মুসলমান প্রতিবেশী। আর যার হক একটি, সে মুশরিক তথা বিধর্মী প্রতিবেশী। এখানে লক্ষণীয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবল প্রতিবেশীত্বের কারণে মুশরিকের হক সাব্যস্ত করেছেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– যে ব্যক্তি তোমার প্রতিবেশী, তার হক উত্তমরূপে মেনে চল। এতে তুমি মুসলমান হয়ে যাবে। আরও বলা হয়েছে–

ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت انه سيورثه -

অর্থাৎ, জিবরাঈল আমাকে সর্বদা প্রতিবেশী সম্পর্কে ওসিয়ত করতেন। এমন কি, আমার ধারণা হল, তাকে ওয়ারিস করে দেবেন।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে– কেয়ামতের দিন প্রথম যে দুই ব্যক্তি বাদানুবাদে লিপ্ত হবে তারা হবে দুই প্রতিবেশী। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মসউদের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ আমার এক প্রতিবেশী আমাকে জ্বালাতন করে, গালি দেয় এবং অতিষ্ঠ করে। তিনি বললেন ঃ যাও, যদি সে তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে, তবে

তুমি তার ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য কর। রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করা হল, অমুক মহিলা দিনে রোযা রাখে এবং সারারাত জেগে এবাদত করে; কিন্তু সে প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন ঃ সে দোযখে যাবে। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি বললেন ঃ সবর কর। এর পর তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারের অভিযোগ শুনে তিনি বললেন ঃ তোমার গৃহের আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। লোকটি তাই করল। লোকজন তার আসবাবপত্রের কাছে এসে জিজ্ঞেস করত, তোমার কি হল? কেউ বলে দিত, তার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিয়েছে। তখন লোকেরা বলত, আল্লাহ তার প্রতি লানত করুন। অবশেষে তার প্রতিবেশী তার কাছে এসে বলল ঃ তোমার আসবাবপত্র তুলে নাও। আল্লাহর কসম, পুনরায় আমি আর এরূপ করব না। এক হাদীসে বলা হয়েছে– বরকত ও অমঙ্গল স্ত্রী, গৃহ ও ঘোড়ার মধ্যে হয়ে থাকে। স্ত্রীর বরকত হচ্ছে মোহরানা কম হওয়া, বিবাহ সহজে সম্পন্ন হওয়া এবং সচ্চরিত্রা হওয়া। স্ত্রীর অমঙ্গল হচ্ছে, মোহরানা বেশী হওয়া, বিবাহ কষ্ট সহকারে সম্পন্ন হওয়া এবং চরিত্র নষ্ট হওয়া। গৃহের বরকতময় হওয়ার অর্থ প্রশস্ত হওয়া এবং প্রতিবেশী ভাল হওয়া। গৃহের অমঙ্গলজনক হওয়ার অর্থ সংকীর্ণ হওয়া এবং প্রতিবেশী খারাপ হওয়া। ঘোড়ার বরকত হচ্ছে, অনুগত হওয়া ও উত্তম স্বভাবসম্পন্ন হওয়া এবং তার অমঙ্গল হচ্ছে হঠকারী হওয়া। জানা দরকার, প্রতিবেশীর হক কেবল এটাই নয় যে, তাকে কষ্ট দেবে না। কেননা, এ গুণটি পাথর, ইট ইত্যাদি জড় পদার্থের মধ্যেও আছে। এগুলো কাউকে কষ্ট দেয় না। বরং তার হক হচ্ছে সে কষ্ট দিলে বরদাশত করবে। কেবল বরদাশত করেই ক্ষান্ত হবে না; বরং তার সাথে নম্র ব্যবহার করবে এবং দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করবে। কথিত আছে, নিঃস্ব প্রতিবেশী কেয়ামতের দিন তার ধনী প্রতিবশীকে জড়িয়ে ধরবে এবং বলবে– পরওয়ারদেগার, তাকে জিজ্ঞেস করুন সে তার দয়া থেকে আমাকে কেন বঞ্চিত রেখেছে এবং আমার উপর তার দরজা কেন বন্ধ রেখেছে? ইবনে মুক'নে খবর পেলেন, তার প্রতিবেশী ঋণের দায়ে নিজের গৃহ বিক্রি করে

ফেলেছে। তিনি প্রায়ই তার দেয়ালের ছায়ায় বসতেন। তিনি বললেন ঃ যদি সে নিঃস্বতার কারণে গৃহ বিক্রি করে, তবে আমার দ্বারা তার প্রাচীরের ছায়ায় বসার হক আদায় হবে না। অতঃপর তিনি প্রতিবেশীকে গৃহের মূল্য দিয়ে বললেন ঃ গৃহ বিক্রয় করো না। জনৈক বুযুর্গ বলেন, তাঁর গৃহে ইঁদুরের উৎপাত অনেক বেড়ে গেছে। এতে এক ব্যক্তি তাঁকে বিড়াল পালনের পরামর্শ দিল। তিনি বললেন ঃ এতে বিড়ালের শব্দ শুনে ইঁদুরগুলো প্রতিবেশীর গৃহে চলে যাবার আশংকা রয়েছে। যে বিষয় আমি নিজের জন্যে পছন্দ করি না, তা প্রতিবেশীর জন্যে কিরূপে পছন্দ করব?

সংক্ষেপে প্রতিবেশীর হক এই ঃ তাকে প্রথমে সালাম করবে। তার সাথে দীর্ঘ কথাবার্তা বলবে না এবং তার অবস্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করবে না। অসুস্থ হলে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করবে এবং বিপদে সান্ত্বনা দেবে ও সঙ্গ ত্যাগ করবে না। আনন্দে মোবারকবাদ জানাবে এবং নিজেও তার সাথে আনন্দ প্রকাশ করবে। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবে। ছাদের উপর থেকে তার গৃহের দিকে তাকাবে না। প্রাচীরের উপর কাঠ রেখে, নালা থেকে পানি ফেলে অথবা আঙ্গিনায় মাটি ফেলে তাকে উত্যক্ত করবে না। তার বাড়ীতে যাওয়ার পথ সংকীর্ণ করবে না। তার কোন দোষ জানা গেলে তা গোপন করবে। সে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে অবিলম্বে তার সাহায্যে এগিয়ে যাবে। সে বাড়ীতে না থাকলে তার বাড়ী দেখাশুনা করা থেকে গাফেল হবে না। পার্থিব অথবা ধর্মীয় কোন বিষয় তার অজানা থাকলে ঠিক ঠিক বলে দেবে। সাধারণ মুসলমানের যেসব হক আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও সেগুলো পালন করতে তৎপর হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা কি জান প্রতিবেশীর হক কি? প্রতিবেশীর হক হল, সে সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করা, কর্জ চাইলে তাকে কর্জ দেয়া, অসুস্থ হলে খবর নেয়া এবং মারা গেলে জানাযার সাথে চলা, তার সাফল্যে মোবারকবাদ দেয়া, বিপদে পড়লে সমবেদনা প্রকাশ করা। তার অনুমতি ছাড়া তোমাদের দালান গৃহ উঁচু করবে না, যাতে তার আলো বাতাস বন্ধ হতে পারে। কোন ফলমূল কিনলে তাকে হাদিয়া দেবে। নতুবা গোপনে নিজের গৃহে

আনবে এবং শিশুদেরকে ফল নিয়ে বাইরে যেতে দেবে না, যাতে তার শিশুদের মনে কষ্ট না হয়। তোমার পাতিলের সুগন্ধি দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ো না। কিন্তু তখন, যখন এক চামচ তার বাড়ীতেও পাঠিয়ে দাও। প্রতিবেশীর হক কি তোমরা জান? সেই আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ– প্রতিবেশীর হক সে-ই আদায় করতে পারে, যার প্রতি আল্লাহর রহমত হয়।

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে ওমরের কাছে ছিলাম। তাঁর এক গোলাম যবেহ করা ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ হে গোলাম, ছাগল সাফ করার কাজ হয়ে গেলে প্রথমে আমার প্রতিবেশী ইহুদীকে গোশত দেবে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। গোলাম বলল ঃ আপনি কয়বার বলবেন? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে ওসিয়ত করতেন। এমন কি, আমরা আশংকা করলাম, প্রতিবেশীকে ওয়ারিস করে দেবেন না তো! হেশাম বলেন ঃ হযরত হাসান বসরীর মতে কোরবানীর গোশত ইহুদী, খৃষ্টানদেরকে খাওয়াতে কোন দোষ ছিল না। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ আমার বন্ধু মুহাম্মদ (সাঃ) আমাকে ওসিয়ত করলেন, ব্যঞ্জন পাকালে তাতে শুরবা বেশী দেবে। এর পর প্রতিবেশীর জন্যে কিছু অংশ পাঠিয়ে দেবে। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার দু'জন প্রতিবেশী। একজনের দরজা আমার সামনে এবং অন্যজনের দরজা একটু দূরে। মাঝে মাঝে আমার কাছে দু'জনকে দেয়ার মত জিনিস থাকে না। অতএব তাদের মধ্যে কার হক বেশী? তিনি বললেন ঃ যার দরজা তোমার সামনে তার হক বেশী। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নিজের পুত্রকে প্রতিবেশীর সাথে রুক্ষ ব্যবহার ও কটু কথা বলতে দেখে বললেন ঃ প্রতিবেশীর সাথে এরূপ করো না। কারণ, কথা থেকে যায় এবং মানুষ চলে যায়। হাসান ইবনে ঈসা নিশাপুরী লেখেন ঃ আমি আবদুর রহমান ইবনে মোবারককে জিজ্ঞেস করলাম– প্রতিবেশী আমার কাছে অভিযোগ করে যে, আমার গোলাম তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে; কিন্তু গোলাম তা অস্বীকার করে। এখন গোলামকে প্রহার করতেও আমার মন চায় না।

কারণ, সে হয় তো অপরাধী নয়। তাকে একদম ছেড়ে দেয়াও খারাপ মনে হয়। কারণ, এতে প্রতিবেশী আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এমতাবস্থায় আমি কি করব? হযরত আবদুর রহমান জওয়াবে বললেন ঃ তোমার গোলাম তোমার সাথে কোন অপরাধ করলে তাকে তখন সাজা দিয়ো না। এর পর যখন প্রতিবেশী অভিযোগ করে, তখন পূর্ব অপরাধের জন্যে শাসন কর। এমতাবস্থায় প্রতিবেশীও সন্তুষ্ট হবে এবং গোলামেরও সেই অপরাধেই সাজা হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ উত্তম চরিত্রের দশটি বিষয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন। এগুলো পুত্রের মধ্যে থাকতে পারে এবং পিতার মধ্যে না-ও থাকতে পারে– (১) সত্যবাদিতা, (২) লোকের সাথে সদ্ব্যবহার, (৩) ভিক্ষুককে দান করা, (৪) সদাচরণের প্রতিদান দেয়া, (৫) আত্মীয়তা বজায় রাখা, (৬) আমানতের হেফাযত করা, (৭) প্রতিবেশীর হক মেনে চলা, (৮) সহচরের সম্মান করা, (৯) অতিথি সেবা করা এবং (১০) লজ্জা করা। এটা সবগুলোর মূল বিষয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হে মুসলমান মহিলাগণ, কোন প্রতিবেশিনী যেন তার প্রতিবেশিনীর প্রেরিত বস্তুকে নগণ্য মনে না করে, যদিও তা ছাগলের খুরই হয়। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ আমি কোন কাজ ভাল করেছি, না খারাপ করেছি– একথা কিরূপে জানব? তিনি বললেন ঃ যদি তোমার প্রতিবেশীকে ভাল করেছ বলতে শুন, তবে জানবে ভাল করেছ। আর যদি প্রতিবেশীকে খারাপ করেছ বলতে শুন, তবে জানবে খারাপ করেছ।

আত্মীয় স্বজনের হক ঃ নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

يقول الله تعالى انا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমি রহমান। আর এই রেহেম তথা আত্মীয়তা নামকে আমি আমার নাম থেকে নির্গত করেছি। অতএব যে এই আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আমি তাকে বজায় রাখব। আর যে

একে ছিন্ন করবে, আমি তাকে ছিন্ন করব। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

من سره ان يبسط له فى رزقه وان يسئله فى اثره فليصل رحمه ـ

যে ভাল মনে করে যে, তার মৃত্যু বিলম্বিত হোক এবং রিযিক বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তা বজায় রাখে।

এক হাদীসে আছে– যে এ বিষয়ে আনন্দিত হয় যে, তার আয়ু দীর্ঘ হোক এবং রিযিক বেড়ে যাক, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং আত্মীয়তা বজায় রাখে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে, আত্মীয়তা অধিক বজায় রাখে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে। হযরত আবু যর বলেন ঃ আমার বন্ধু (সাঃ) আমাকে আদেশ করেছেন– আত্মীয়তা বজায় রাখ যদিও তোমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা হয় এবং সত্য কথা বল যদিও তিক্ত হয়। যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশে বের হন, তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ যদি আপনি সুন্দরী রমণী ও লাল উট লাভ করতে চান, তবে মুদাল্লাজ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করুন। সেখানে এগুলোর প্রাচুর্য আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুদাল্লাজ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তারা আত্মীয়তা বজায় রাখে। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন ঃ আমার কাছে আমার জননী আগমন করলে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ আমার মা এসেছেন। তিনি এখনও মুশরিক। আমি তার সাথে দেখা করব কি? তিনি বললেন হাঁ। এক রেওয়ায়েতে আছে; আমি তাকে কিছু দেব কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আত্মীয়তা বজায় রাখ। এক হাদীসে বলা হয়েছে; ফকীর মিসকীনকে সদকা করলে একটি সদকাই হয়; কিন্তু আত্মীয়কে কিছু দিলে দুটি সদকা হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ـ

অর্থাৎ, তোমার প্রিয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত পুণ্য লাভ করবে না।

এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁর প্রিয় বাগানটি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে চাইলেন। তিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ এই বাগান আল্লাহ্র পথে ফকীর ও মিসকীনদের জন্যে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার সওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন একে তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন ঃ অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে, এমন আত্মীয়কে দান করা উত্তম। এটা এমন, যেমন বলা হয়েছে, তার সাথে মিল যে তোমার থেকে আলাদা থাকে; তাকে দাও যে তোমাকে বঞ্চিত করে এবং তাকে মার্জনা কর যে তোমার উপর জুলুম করে।

সন্তান ও পিতামাতার হক ঃ প্রকাশ থাকে যে, আত্মীয়তা যত নিকটতর ও মজবুত হয়, হকও ততই জোরদার হয়। সন্তানের সাথে পিতামাতার আত্মীয়তাই সর্বাধিক মজবুত ও নিকটবর্তী। তাই অন্যান্য আত্মীয়ের চেয়ে পিতামাতার হক বেশী। পিতামাতা সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সন্তান যদি পিতাকে গোলাম অবস্থায় পায়, অতঃপর তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে, তবুও পিতার হক আদায় হবে না। তিনি আরও বলেন ঃ পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা নামায, রোযা, হজ্জ ওমরা ও আল্লাহর পথে জেহাদ করার চেয়ে উত্তম। আরও বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি সকালে পিতা ও মাতা উভয়কে সন্তুষ্ট করবে, তার জন্যে জান্নাতের দিকে দু'টি দরজা খুলে যায়। সন্ধ্যায় যে এরূপ করে তার জন্যেও তাই হয়। পিতামাতার একজন থাকলে এক দরজাই খুলবে– যদিও তারা উভয়েই জুলুম করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সকালে পিতামাতাকে নারাজ করে, তার জন্যে দোযখের দিকে দু'টি দরজা খুলে যায়। আর যে সন্ধ্যায় নারাজ করে, তার অবস্থাও তদ্রূপ। একজন থাকলে এক দরজা খুলবে– যদিও তারা জুলুম করে। একথাগুলো তিনি তিন বার উচ্চারণ করলেন। এক হাদীসে আছে– জান্নাতের সুগন্ধি পাঁচ'শ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু নাফরমান সন্তান ও আত্মীয়তা ছিন্নকারী তার ঘ্রাণ পাবে না। আরও বলা হয়েছে, নিজের পিতামাতা, ভাইবোন ও অন্যান্য আত্মীয়দের প্রতি আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী অনুগ্রহ কর। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে বললেন ঃ হে মূসা, যে

ব্যক্তি তার পিতামাতার আনুগত্য করে, আমি তাকে অনুগত হিসাবে লেখি। আর যে ব্যক্তি পিতামাতার নাফরমানী করে এবং আমার আনুগত্য করে, আমি তাকে নাফরমান হিসেবে লেখি। কথিত আছে, যখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে মিসরে গেলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-দাঁড়াননি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন, তুমি তোমার পিতার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া কঠিন মনে করলে কি? আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, তোমার ঔরস থেকে কোন নবী পয়দা করব না। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ কেউ সদকা দিতে চাইলে নিজের পিতামাতার নামে দিতে পারে, যদি তারা মুসলমান হয়। এই সদকার সওয়াব তারা উভয়ে পাবে এবং পুত্রও তাদের সমান সওয়াব পাবে, তাদের সওয়াব হ্রাস করা ব্যতীতই। মালেক ইবনে রবীয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় বনী সালমার এক ব্যক্তি এসে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা মারা গেছেন। আমার উপর তাদের আদায় করার মত কোন হক আছে কি? তিনি বললেন ঃ তাদের জন্যে নামায পড়ে মাগফেরাতের দোয়া কর, তাদের অঙ্গীকার-ওসিয়ত পূর্ণ কর, তাদের বন্ধুদের সম্মান কর এবং তাদের কারণে যেসব আত্মীয়তা আছে সেগুলো বজায় রাখ। তিনি আরও বলেন ঃ মায়ের সাথে সদাচরণ পিতার তুলনায় দ্বিগুণ। আর বলা হয়েছে ঃ মায়ের দোয়া দ্রুত কবুল হয়। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ মা পিতার তুলনায় অধিক মেহেরবান হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি কার সাথে সদাচরণ করব? তিনি বললেন ঃ নিজের সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ কর। তোমার পিতা-মাতার যেমন তোমার উপর হক রয়েছে, তেমনি তোমার সন্তানের প্রতিও হক রয়েছে। এক হাদীসে আছে– আল্লাহ সেই পিতার প্রতি রহম করুন, যে তার সন্তানকে সৎ হতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, এমন মন্দ কাজ করে না, যদ্দ্বারা সন্তান নাফরমান হয়ে যায়। কথিত আছে, সন্তান সাত বছর বয়স পর্যন্ত পিতার খেলনা ও ফুলের তোড়া, আরও সাত বছর পর্যন্ত খাদেম, এর পর হয় দুশমন, না হয় শরীফ। আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সন্তান জন্মের সপ্তম

দিনে তার নাম রাখবে ও আকীকা করবে এবং চুল ইত্যাদি পরিষ্কার করবে। ছয় বছর হলে তাকে আদব শিক্ষা দেবে। বয়স নয় বছর হলে তার বিছানা আলাদা করে দেবে। তের বছর বয়স হলে তাকে নামায পড়ার জন্যে প্রয়োজনবোধে প্রহার করবে। যখন বয়স ষোল বছরে পৌঁছে, তখন বিয়ে করাবে এবং হাত ধরে বলবে– আমি তোমাকে আদব শিখিয়েছি, লেখাপড়া করিয়েছি এবং বিয়ে দিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার ফেতনা থেকে এবং আখেরাতে তোমার আযাব থেকে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, সন্তানের হক পিতার উপর এই যে, তাকে ভাল আদব শেখাবে এবং তার ভাল নাম রাখবে। এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের কাছে নিজের পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি বললেন ঃ তুমি কখনও তাকে বদদোয়া করেছ কি? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তা হলে তুমি নিজেই তাকে নষ্ট করেছ। এখন এর কি প্রতিকার! সন্তানের প্রতি দয়া ও নম্রতা করা মোস্তাহাব। আকরা ইবনে হাবেস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখলেন, তিনি শিশু ইমাম হাসানকে আদর করছেন। আকরা আরজ করলেন ঃ আমার দশটি সন্তান আছে,আমি তাদের মধ্যে কাউকে আদর করিনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ من لا يرحم لا يرحم (যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে একদিন বললেন ঃ ওসামার মুখ ধুয়ে দাও। আমি তার মুখ ধৌত করতে লাগলাম। কিন্তু ঘৃণা লাগছিল। তিনি আমার হাত ঝটকা দিয়ে নিজেই ধুয়ে দিলেন এবং আদর করলেন। অতঃপর বললেন ঃ সে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে যে, মেয়ে হয়নি। একবার তিনি যখন মিম্বরে ছিলেন, তখন হাসান (আঃ) পিছলে পড়ে গেলেন। তিনি মিম্বর থেকে নেমে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি ফেতনা বৈ নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন ঃ একদিম রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়াচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত হাসান (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁর

ঘাড়ে সওয়ার হয়ে গেলেন। তিনি সেজদায় অনেক বিলম্ব করলেন; এমন কি, নামাযীরা মনে করল, হয় তো আজ কোন নতুন ব্যাপার ঘটেছে। নামাযান্তে মুসল্লীরা আরজ করল ঃ আপনি দীর্ঘ সেজদা করেছেন। ফলে আমরা নতুন কিছু ঘটেছে বলে ধারণা করলাম। তিনি বললেন ঃ আমার সন্তান আমার উপর সওয়ার হয়ে গিয়েছিল, তাই তার মতলব পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে দেয়া ভাল মনে করিনি। এতে কয়েকটি উপকারিতা পাওয়া গেল– প্রথম, আল্লাহর নৈকট্য, যা সেজদা অবস্থায় অধিক সময় কাটল। দ্বিতীয়, সন্তানের প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পা প্রকাশ পেল। তৃতীয়, উম্মতকে দয়া শিক্ষা দেয়া হল। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– সন্তানের সুগন্ধি জান্নাতের সুগন্ধি সদৃশ। হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) আহনাফ ইবনে কায়েসকে তলব করে বললেন ঃ সন্তান সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, সন্তানরা আমাদের অন্তরের ফল এবং পিঠের বালিশ। আমরা তাদের জন্যে অনুগত পৃথিবী ও ছায়াবিশিষ্ট আকাশ। তাদের জন্যেই আমরা বড় বড় বিপদে ঢুকে পড়ি। তারা কিছু চাইলে দেবেন, রাগ করলে আদর করে তুষ্ট করবেন। তখন তারা মনে প্রাণে আপনাকে ভালবাসবে। আপনি তাদের প্রতি কঠোর হবেন না। তাহলে আপনার প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে তারা আপনার দ্রুত মৃত্যু কামনা করবে। আমীর মোয়াবিয়া বললেন ঃ আহনাফ, আল্লাহর কসম, তোমার আগমনের পূর্বে আমি এযীদের প্রতি ভীষণ রাগান্বিত ছিলাম। আহনাফ চলে গেলে আমীর মোয়াবিয়া এযীদের প্রতি প্রসন্ন হলেন এবং দু'লাখ দেরহাম ও দু'শ থান তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এযীদ এথেকে অর্ধেক আহনাফকে দিয়ে দিল।

এসব হাদীসদৃষ্টে বুঝা যায়, পিতামাতার হক অত্যন্ত জোরালো। এটা ভ্রাতৃ সম্পর্ক থেকেও অধিক জোরদার। এতে অতিরিক্ত দু'টি বিষয় রয়েছে– (১) অধিকাংশ আলেমের মতে, সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহে পিতামাতার আনুগত্য ওয়াজিব। তবে খাঁটি হারাম কাজে ওয়াজিব নয়। যদি তারা তোমাকে ছাড়া খেতে নারাজ হয়, তবে তোমার উচিত তাদের সাথে খাওয়া। কেননা, সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করার নাম পরহেযগারী। আর পিতামাতাকে সন্তুষ্ট রাখা ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিবের উপর

পরহেযগারী অগ্রাধিকার পেতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন নফল কাজে পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সফর করা তোমার জন্যে জায়েয নয়। বিলম্ব না করে ফরয হজ্জে যাওয়াও নফল। কেননা, বিলম্বেও তা আদায় করা যায়। এলেমের অন্বেষণে সফর করাও নফল। তবে যদি নামায, রোযা ও অন্যান্য ফরযের এলেম হাসিল করা উদ্দেশ্য থাকে এবং শহরে কোন শিক্ষাদাতা না থাকে, তবে পিতামাতার হক আদায়ে আবদ্ধ না থেকে দেশ ছেড়ে দেবে। নতুবা তাদের ইচ্ছা ছাড়া সফর করবে না। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি ইয়ামন থেকে হিজরত করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে জেহাদ করার সংকল্প প্রকাশ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়ামনে তোমার পিতামাতা আছে কি? সে আরজ করল ঃ আছে। তিনি শুধালেন ঃ তারা তোমাকে অনুমতি দিয়েছে কি? সে আরজ করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রথমে গিয়ে তাদের অনুমতি নাও। অনুমতি দিলে এসে জেহাদ কর। নতুবা যতটুকু সম্ভব তাদের আনুগত্য কর। কেননা, এটা তওহীদের পরে সর্বোত্তম আমল, যা তুমি আল্লাহ তাআলার সামনে নিয়ে যাবে। অন্য এক ব্যক্তি জেহাদের ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মা জীবিত আছে কি? সে আরজ করল ঃ আছে। তিনি বললেন ঃ তার সাথে থাক। জান্নাত তার পদতলে। অন্য এক ব্যক্তি খেদমতে হাযির হয়ে হিজরতের বয়াত করার আবেদন করল এবং বলল ঃ আমার পিতামাতাকে কাঁদিয়ে আপনার কাছে এসেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের কাছে যাও এবং যেমনি কাঁদিয়েছ তেমনি হাসাও। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

حق كبير الاخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده .

অর্থাৎ, বড় ভাইদের হক ছোট ভাইদের উপর পুত্রের উপর পিতার হকের অনুরূপ।

গোলাম ও চাকরদের হক ঃ প্রকাশ থাকে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্বশেষ ওসিয়ত ছিল, তোমরা তোমাদের গোলাম ও বাঁদীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। তোমরা যা খাবে তা থেকে তাদেরকে খাওয়াবে; যা পরিধান করবে, তা থেকে তাদেরকে পরিধান করাবে। তাদের দ্বারা বলপূর্বক এমন কাজ করাবে না যার সাধ্য তাদের নেই।

তাদের মধ্যে যাকে পছন্দ করবে তাকে রাখবে, আর যাকে অপছন্দ করবে তাকে বিক্রি করে দেবে। আল্লাহর সৃষ্টিকে আযাব দিয়ো না। তিনি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে তাদের মালিকানাধীন করে দিতেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আমরা খাদেমের ক্রটি-বিচ্যুতি কয়বার মার্জনা করব? তিনি চুপ করে রইলেন। এর পর বললেন ঃ প্রত্যহ সত্তর বার মার্জনা করবে। হযরত ওমর (রাঃ) প্রত্যেক শনিবারে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত আওয়ালী যেতেন। তিনি যদি গোলামদেরকে কোন সাধ্যাতীত কাজে নিয়োজিত দেখতেন, তবে তাদের কাজ কিছুটা হ্রাস করে দিতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে সওয়ারীতে দেখলেন। তার গোলাম তার পেছনে দৌড়ে আসছিল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা, একেও তোমার পেছনে বসিয়ে নাও। কারণ, সে তোমার ভাই। তোমার মধ্যে যেমন প্রাণ আছে তেমনি তার মধ্যেও আছে। লোকটি গোলামকে পেছনে বসিয়ে নিল। অতঃপর হযরত আবু হোরায়রা বললেন ঃ বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে দূরেই সরে যায় যে পর্যন্ত গোলাম তার পেছনে পায়ে হেঁটে চলে। আহনাফ ইবনে কায়েসকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি সহনশীলতা কার কাছে শিখেছেন? তিনি বললেন ঃ কায়েস ইবনে আসেমের কাছে। তাঁর প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে, তিনি গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর বাঁদী কাবাবের একটি শিক তাঁর কাছে নিয়ে এল। শিক বাঁদীর হাত থেকে ছুটে গিয়ে কায়েসের ছেলের উপর পড়ে। ফলে সে আহত হয়ে মারা গেল। বাঁদী অত্যন্ত ভীত হল। তিনি ভাবলেন, মুক্ত করা ছাড়া তার ভয় দূর করা যাবে না। তিনি বললেন ঃ ভয় করিস না। যা, তুই মুক্ত। আওন ইবনে আবদুল্লাহর গোলাম তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করলে তিনি বলতেন, তুই তোর প্রভুর মত হয়ে গেছিস। তোর প্রভু আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে আর তুই তোর মনিব প্রভুর নাফরমানী করিস। একদিন গোলাম তাঁকে অনেক ব্যথা দিলে তিনি বললেন ঃ তোর ইচ্ছা আমি তোকে প্রহার করি। কিন্তু তা হবে না। যা, তুই মুক্ত। মায়মুন ইবনে মেহরানের কাছে মেহমান এলে তিনি বাঁদীকে তাড়াতাড়ি খানা আনতে বললেন । বাঁদী হাতে খাদ্যভর্তি পেয়ালা নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হল। পা পিছলে যাওয়ার কারণে গরম খাদ্য তার প্রভুর

মাথায় পড়ে গেল। তিনি আর্তচিৎকার করে বললেন ঃ আমাকে জ্বালিয়ে দিল রে। বাঁদী শশব্যস্ত হয়ে আরজ করল ঃ হে নেকী ও আদবের গুরু, আল্লাহ তাআলার এরশাদ অনুযায়ী কাজ করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ তাআলার এরশাদ কি? বাঁদী বলল ঃ আল্লাহ বলেন– وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ যারা ক্রোধকে দমন করে। মায়মুন বললেন ঃ আমি ক্রোধ দমন করলাম। বাঁদী বলল ঃ এর পর আল্লাহ বলেছেন– وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে। তিনি বললেন ঃ আমি তোকে ক্ষমা করলাম। বাঁদী বলল ঃ আরও কিছু সদাচরণ করুন। কেননা, আল্লাহ বলেন ঃ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আল্লাহ সদাচরণকারীদেরকে ভালবাসেন। তিনি বললেন ঃ তুই আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। ইবনে মুনকাদির বলেন ঃ জনৈক সাহাবী তাঁর গোলামকে প্রহার করলেন । গোলাম বলতে শুরু করল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ছেড়ে দিন, কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোলামের ফরিয়াদ শুনে সাহাবীর কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে সাহাবী প্রহার বন্ধ করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই গোলাম তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়েছে; কিন্তু তুমি মাফ করনি। এখন আমাকে দেখে হাত গুটিয়ে নিয়েছ। সাহাবী লজ্জিত হয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সে মুক্ত। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি এরূপ না করতে, তবে দোযখের আগুন তোমার মুখ ভস্ম করে দিত। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– গোলাম যখন তার প্রভুর কল্যাণে কাজ করে এবং আল্লাহ তাআলার এবাদত উত্তমরূপে সম্পাদন করে, তখন সে দ্বিগুণ সওয়াব পায়। আবু রাফে (রাঃ) যখন মুক্ত হলেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আমি দু'রকম সওয়াব পেতাম। এখন একটি চলে গেল। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার সামনে এরূপ তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়, যারা সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে এবং এরূপ তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়, যারা সর্বপ্রথম দোযখে ঢুকবে। যে তিন ব্যক্তি সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে, তাদের একজন শহীদ, দ্বিতীয় জন সেই গোলাম, যে আল্লাহ তাআলার এবাদত উত্তমরূপে করে এবং প্রভুর মঙ্গলের জন্যে কাজ করে। তৃতীয় জন পুণ্যবান, অধিক সন্তানবিশিষ্ট, সওয়াল বর্জনকারী ব্যক্তি। আর যে তিন ব্যক্তি সর্বপ্রথম দোযখে ঢুকবে, তাদের প্রথম জন জালেম আমীর; দ্বিতীয় জন এমন ধনী, যে আল্লাহর হক আদায় করে না

এবং তৃতীয় জন আস্ফালনকারী ফকীর। হযরত আবু মসঊদ আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার গোলামকে প্রহার করছিলাম, এমন সময় পেছনের দিক থেকে দু'বার শব্দ শুনলাম, হে আবু মসঊদ, খবরদার। মুখ ফিরিয়ে দেখি রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে আছেন। আমার হাত থেকে বেত পড়ে গেল। তিনি বললেন ঃ তার উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা তোমার উপর আল্লাহ তাআলার রয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে– যখন তোমাদের কেউ গোলাম ক্রয় করে, তখন প্রথমে যেন তাকে মিষ্টি খাওয়ায়। এটা তার পক্ষে ভাল। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কারও জন্যে তার গোলাম খানা নিয়ে এলে সে যেন তাকে সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ায়। এরূপ না করলে তাকে আলাদা দিয়ে দেবে। এক ব্যক্তি হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর খেদমতে পৌঁছে দেখল, তিনি আটা গুলছেন। লোকটি আরজ করল ঃ আপনি গুলছেন কেন? গোলাম কোথায়? তিনি বললেন ঃ গোলামকে অন্য কাজে পাঠিয়েছি। তাকে এক সাথে দু'কাজ দেয়া আমি পছন্দ করিনি। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته তোমরা সকলেই প্রজাওয়ালা। তোমাদের প্রত্যেককেই তার প্রজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

মোট কথা, গোলামের হক সংক্ষেপে এই ঃ খাদ্য ও পোশাকে তাদেরকে নিজের শরীক করবে এবং তাদের দ্বারা সাধ্যাতিরিক্ত কাজ নেবে না। তাদেরকে অহংকার ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে না। তাদের ক্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা করবে। তাদের প্রতি ক্রোধ হলে চিন্তা করবে, তুমিও তো আল্লাহ তাআলার গোলাম, তাঁর আনুগত্যে ক্রুটি-বিচ্যুতি করে থাক। তিনি শাস্তি দেন না। এ গোলাম অন্যায় করে থাকলে তাতে আশ্চর্য কি? আল্লাহ তাআলা তোমার উপর অধিক ক্ষমতাবান।

দ্বিতীয় খণ্ড
সমাপ্ত